ছোটদের

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ছোটদের

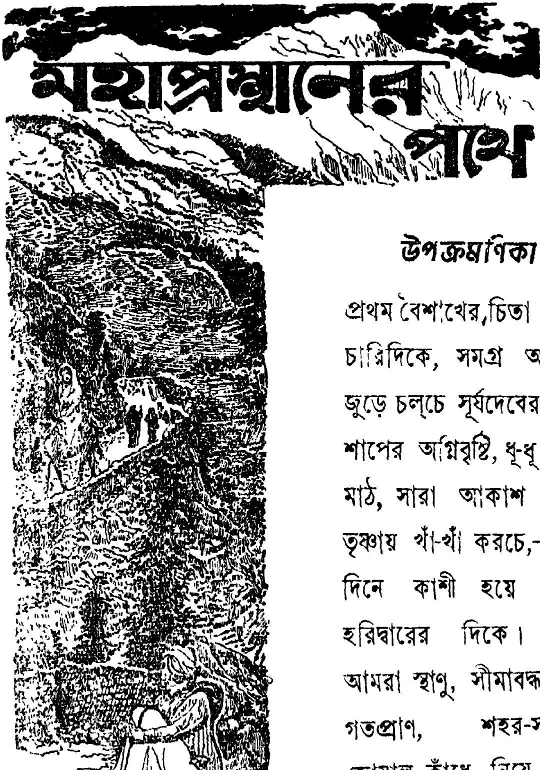
মহাপ্রস্থানের পথে

তৃতীয় মুদ্রণ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

এই বইয়ের ভিতরের ছবি আঁকিয়াছেন
শিল্পাচার্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত এবং মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকতা ৬ হইতে
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।



উপক্রমণিকা

প্রথম বৈশাখের, চিতা জ্বল্‌চে চারিদিকে, সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে চল্‌চে সূর্যদেবের অভিশাপের অগ্নিবৃষ্টি, ধূ-ধূ করচে মাঠ, সারা আকাশ মেঘের তৃষ্ণায় খাঁ-খাঁ করচে,—এমন দিনে কাশী হয়ে ছুটলাম হরিদ্বারের দিকে। যখন আমরা স্থাণু, সীমাবদ্ধ, গৃহগতপ্রাণ, শহর-সভ্যতার জোয়াল কাঁধে নিয়ে চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরি, তখন বুঝিনে এর বাইরে আছে বৃহত্তর জগৎ, উদার জীবন; চারিদিকে যেমন জমে জঞ্জাল, তেমনি জোটে মানুষ; কিন্তু যেদিন আসে পথের

ডাক, যেদিন বাজে দূরের ব্যাকুল বাঁশি, সেদিন আমাদের গা-ঝাড়া দিয়ে একা-একাই ছুটে বেরুতে হয়। তখন আর অপেক্ষা নেই, পিছনে চাওয়া নেই।

পার হ'লো ফয়জাবাদ, পার হ'লো লক্ষ্ণৌ, পিছনে রইল বেরিলী, গাড়ি চললো ছুটে। আমার এই যাত্রার পথে কোনো পরিকল্পনা ছিল না, আয়োজন ছিল না, এ যেমন বিশৃঙ্খল তেমনি আকস্মিক। রাত্রিশেষে লাক্‌সার অতিক্রম করে যখন হরিদ্বারে এসে পৌঁছলাম, তখন চেয়ে দেখি এ একেবারে নতুন রাজ্য! শীতের হাওয়ায় সর্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেচে; এমন ঠাণ্ডা যে হাত-পা জড়িয়ে যায়; গরম থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দ হ'লো, শরীরে এলো উৎসাহ, গতির চাঞ্চল্য। রাত্রিশেষের অন্ধকার, মাথার উপরে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ, আশেপাশে কৃষ্ণকায় প্রহরীর মতো পাহাড়ের সারি, মধুর শীতল বাতাস—এদেরই ভিতর দিয়ে পথ চিনে চিনে চললাম ধর্মশালার দিকে। ধর্মশালাই তীর্থযাত্রীর অবলম্বন।

হিমালয়ের যতগুলি প্রবেশ-পথ আছে তাদের মধ্যে হরিদ্বার হচ্ছে প্রশস্ত ও সুগম। এখানে তিনটি মাত্র ঋতু—বর্ষা, শীত এবং বসন্ত। নিকটে গঙ্গার নীলধারা, কলস্বনা, উপল-মুখরা। নদীর তীরে তীরে সন্ন্যাসীগণের আস্তানা ও আসন, ধুনি জ্বলচে, বেদ, গীতা, তুলসীদাসের আলোচনা। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, কুশাবর্তে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ—কোথাও চাঞ্চল্য নেই, জীবন-সংগ্রাম নেই, নির্বি-

বাদ এবং নির্লিপ্ত। এ সময়টায় বহু যাত্রীর ভিড়, অনেকেরই পথ বদরীনারায়ণের দিকে, চোখে-মুখে উৎসাহ, যাত্রার আয়োজন, তাদেরই সঙ্গে পাণ্ডা ও কুলীদের কচ্‌কচি। ছোট শহর, ছোট বাজার,—বাজারে শীতকালের আনাজ-তরকারি থরে থরে সাজানো —ওদিকে ভোলাগিরির ধর্মশালা ও আশ্রম। আশ্রমে বাঙালীর কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তিই বেশি। সকলেই গৃহবিরাগী, গেরুয়াধারী, মুণ্ডিতমস্তক—ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান অনেক আছেন, কোথাও তাঁরা আত্মপরিচয় দেন না, দেবার কথাও নয়, গঙ্গার তীরে এই আশ্রমে তপস্যায় তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেচেন।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে যাত্রা। যাঁদের সঙ্গে ধর্মশালায় থাকতে অল্প পরিচয় হয়েছিল তাঁদের কাছে ম্লান হেসে বিদায় নিলাম। ধর্মশালার ম্যানেজার একটি বাঙালী ছোকরা, নাম—চাটুয্যে, গাইয়ে-বাজিয়ে,মধুর ব্যবহারে তিনি সকল যাত্রীকে মুগ্ধ করেচেন। তিনি সকরুণ চোখে বিদায় দিলেন। পথে নেমে এলাম। পরনে গৈরিকবাস, কাঁধের একদিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা কম্বল, আর এক-দিকে ঝোলা, হাতে লাঠি ও দড়ি-বাঁধা লোটা, পায়ে ক্যাম্বিসের নতুন জুতো। চোখে শূন্য দৃষ্টি, হৃদয়ে অবসন্নতা, আত্মগ্লানি, প্রাণে ভয়, দেহ নিরুৎসাহ,—এমনি করেই টল্‌তে টল্‌তে পথ দিয়ে চললাম। বাজার পার হয়ে এলাম বড় রাস্তার উপর, হৃষীকেশ পর্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়। গলা শুকিয়ে উঠেছিল, এক ঘটি সরবৎ খেয়ে গাড়িতে এসে উঠলাম। দশ আনা ভাড়া, পনেরো

মাইল পথ। কে যেন পিছন থেকে ঠেল্‌চে। হায়রে, "মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে বসন রাঙালে যোগী !"

বেলা দেখতে দেখতে গড়িয়ে এলো, পাহাড়ের পদতল থেকে মাথার দিকে রোদ উঠলো, এক একজন করে' হৃষীকেশের যাত্রী এসে গাড়িতে চড়ে বসলো। কত জটলা, কত কলরব। মাথায় পাগ্‌ড়ি-বাঁধা, খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ,—একটি সাধু এসে উঠলেন। তাঁর বয়স অল্প মনে হওয়াতে এবং তাঁর কাছেও ঝুলি-লোটা দেখে সাহস করে' করুণ কণ্ঠে বললাম, 'আপ্‌ কাঁহা যায়ঙ্গে, সাধুজী ?'

মুখের দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন। গাড়ি ততক্ষণে ছেড়েচে। তাঁর হাসি সন্ন্যাসীর স্বর্গীয় হাসি নয়, বন্ধুর হাসি। বললেন, 'বদরীনারায়ণ। ওঁ নমো নারায়ণায় !'

চুপ করে' মুখ ফিরিয়ে রইলাম। একটু আনন্দ হ'লো, যাক্‌ সঙ্গী পেলাম ! কিন্তু সে-আনন্দ প্রকাশ করে' দুর্বলতার পরিচয় দিতে বাধলো। মিনিটখানেক পরে ঝুলির ভিতর থেকে দু' খিলি সাজা পান বা'র করে' হাত বাড়িয়ে সাধুটি স্মিতহাস্যে বললেন, 'লিজিয়ে মহারাজ, খাইয়ে।'—বলে' অন্য হাতে তিনি বিড়ি বা'র করলেন।

মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। তিনি আবার হাসলেন। হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'কোথা থেকে আসচেন ?'

হেসে বললাম, 'এতক্ষণ চিনতে পারিনি, আপনি বাঙালী ?'

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

'হ্যাঁ, আপনি বদরীনাথ যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

চলন্ত গাড়ির মধ্যে আলাপ চল্‌তে লাগল। নাম তাঁর পাগ্‌লা ভোলা ব্রহ্মচারী ; ব্রহ্মচারী বলেই পরিচিত। বহুদিন হ'লো সংসার ত্যাগ করেচেন, পরিব্রাজক হয়ে বহু দেশ পর্যটন করেচেন। সংসারে কে আছে এবং কে নেই তার হিসাব রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও নেই। ভগবদ্‌গীতা তাঁর মুখস্থ,—সংসার মায়া, কর্মত্যাগেই মুক্তি। ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আত্মদান ছাড়া মানুষের গতি নেই, তুচ্ছ জীবন, মোক্ষলাভই পরম লক্ষ্য। ভক্তিভরে তাঁর বাণী শুন্‌ছিলাম। তিনি বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে আলাপ করছিলেন।

গঙ্গার তীরে তীরে গাড়ি চল্‌চে, কোথাও উঁচুনীচু পার্বত্য পথ, মাঝে মাঝে উপলখণ্ডময় শীর্ণস্রোতা ঝরনা, কোথাও কোথাও সন্ন্যাসীর আস্তানা, ছোট ছোট দেবালয়, নদীর ওপারে পাহাড়, নীচে বাব্‌লার ঘন জঙ্গল। গাড়ি ছুটে চলেচে। বাঁ দিকে রেলপথ দেরাদুনের দিকে গেচে, ছোট ছোট স্টেশন্ জনবিরল, দক্ষিণে হৃষীকেশের পথ। পথে যেতে পড়লো ভীমগোড়া চটি। এখানে আছে একটি গুহা, পুরাকালে ভীমের অশ্বক্ষুরাঘাতে গুহার ক্ষত নাকি গভীর হয়েছিল। তারপর এলো সত্যনারায়ণের মন্দির, মন্দিরের কাছে কালীকম্বলীওয়ালার সদাব্রত চটি। যাঁরা দাগী সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁরা বিনামূল্যে এখানে আহার ও আশ্রয় পেয়ে

থাকেন। গাড়ি কয়েক মিনিটের জন্য থামলে ব্রহ্মচারী নেমে মন্দির দর্শন করে এলেন। দেব, দ্বিজ ও সন্ন্যাসীতে তাঁর অবিচলিত ভক্তি!

দিনের অবসান হয়েচে, পশ্চিম দিগন্তের রক্তলেখা ইতিমধ্যে কখন ম্লান হয়ে গেচে, বনচ্ছায়া ও পর্বতের ঝিল্লিরব জেগে উঠেচে, গাড়ি এসে থামলো হৃষীকেশের এক ধর্মশালার নিকটে। সবাই নেমে এলাম। এতক্ষণে একটু নির্ভয় হয়েচি। কাছেই কালী-কম্বলীওয়ালার বিরাট ধর্মশালা, এখানেই তাঁদের হেড আপিস। এই কম্বলীওয়ালা ছিলেন এক সাধু। অখ্যাত, নগণ্য এই সাধু গিয়েছিলেন বদরীনাথে, সম্বল ছিল একখানি মাত্র কালো কম্বল। পথে পেয়েছিলেন অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট, উপবাসে দিন কাটতো, দরিদ্র যাত্রীদের কাছে দরিদ্র সাধুর ভিক্ষাও জুটতো না। কিন্তু এই মহাপুরুষ একদিন নাকি আপন পরিশ্রম ও চেষ্টায়, হৃদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে দেশে দেশে ভিক্ষা সংগ্রহ করে নিরুপায় সাধু-সন্ন্যাসীর দুঃখ লাঘব করেচেন। তাঁরই কৃপায় এখন পথের মাঝে মাঝে 'সদাব্রত' প্রতিষ্ঠা হয়েচে। আজ তিনি এ জগতের কোথাও নেই, কিন্তু অসংখ্য নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর নতমস্তকের প্রণাম নিরন্তর তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছয়।

ব্রহ্মচারী বললে, 'আমাকেও ত সদাব্রত নিতে হবে দাদা! গরীব লোক, সেই আশাতেই ত এসেচি। আপনি একটু বলে কয়ে দিন দয়া করে।'

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

ভিতরে লোকজনের জটলা, কোলাহল, যাত্রীর ভিড়, তারই ভিতর দিয়ে পথ কেটে গদীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হিসাবপত্র নিয়ে গদীর ম্যানেজার ও কেরানী বসে রয়েচে। আশেপাশে প্রায় জন পঁচিশ-তিরিশ সাধু-ভিক্ষুক করজোড়ে করুণনেত্রে দণ্ডায়মান। কেউ কেউ প্রত্যাখ্যাত হয়ে আপন আপন অবস্থার কথা নিবেদন করচে, কেউ বদরীনারায়ণের শপথ করে বল্‌চে, সে প্রকৃতই সন্ন্যাসী, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ভ্রমণের সখ নিয়ে সে আসেনি, সে নিতান্তই নিরুপায় তীর্থযাত্রী। ভাবগতিক দেখে ব্রহ্মচারীর মুখখানি শুকিয়ে গেল। এবং যখন সত্যিই শুন্‌লো যে সেও সদাব্রতের টিকিট পাবে না, তখন সে সেইখানে বসে পড়ে বললে, 'কি হবে দাদা, আমি যে অনেক আশা করে····শুনেছিলাম যে আসে সে-ই টিকিট পায় !'

এ কথা সে জানে না, পৃথিবীতে এত বড় দানশীলতা কোথাও নেই। দান সম্বন্ধে কড়াকড়ি আছে বলেই দানের এত মূল্য !

অতএব নিরাশ হয়ে ব্রহ্মচারীকে ফিরতে হ'লো। তার মুখের চেহারা দেখে ভয় পেলাম, যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখেচি তার পথে, সেটুকু নিঃশেষে মুছে গেল, কণ্ঠ হ'লো রুদ্ধ, সর্বহারার মতো হতাশা-ম্লান চোখে তাকিয়ে সে বললে, 'তবে ফিরে যাই···· সামান্য পাঁচ-সাত টাকা নিয়ে এতদিনের পথ······ফিরেই যাই তাহ'লে !'

মনটা খারাপই হয়ে গেল। বললাম, 'ফিরে যাওয়া ছাড়া

উপায়ই বা কী, সত্যি ত আর উপবাস করে পথ হাঁটা যায় না।'

পরমুখাপেক্ষার চেহারাই এমনি। যখন সে আশায় জ্বলে তখন দাবানল, যখন নিবে যায় তখন সে একেবারেই ভস্মস্তূপ। ব্রহ্মচারী যখন নিতান্ত বালকের মতো সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগল, সে সময় স্পষ্টই অনুভব করলাম, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস তার শিথিল হয়ে এসেছে। সদাব্রত না পেয়ে তার দারিদ্র্যের সত্য রূপটা আমার চোখে বিসদৃশ হয়ে ফুটে উঠল।

নীলধারার তীরে এসে বসলাম। অন্ধকার নদী, তরঙ্গসঙ্কুল, জলের উপরে নক্ষত্রের আলো ঝল্‌মল্‌ করচে, ভয়ভীষণ ও রহস্য-ময়; পর্বতের গভীর গহ্বর থেকে কালো জল বন্য জন্তুর মতো চীৎকার করে ছুটে আসচে, স্রোতের অবিশ্রান্ত শব্দে চারিদিক মুখর। তীরে বহুদূর পর্যন্ত কোথাও কোথাও ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাসীরা আসন পেতেচে। একটি নিরুদ্বেগ নিবিড় প্রশান্তি। তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে।

একখানা বড় পাথরের উপর দু'জনে নিঃশব্দে বসেছিলাম। পাথরের গা বেয়ে জল ছুট্‌চে। একাই যাবো, তাকে ফিরে যেতেই হবে, কিন্তু কী বলে সান্ত্বনা দেবো তাই ভাবছিলাম, অথচ এক্ষেত্রে সকল সান্ত্বনাই উপহাসের মতো শোনাবে! আমার এ সমস্যার সে নিজেই সমাধান করে' নিল। অন্ধকারে সে তার আবেগ-আকুল দুই চোখ তুলে আমার একটি হাত ধরে বললে, 'দাদা, এত পরিশ্রম আমার পণ্ড হ'লো, ফিরেই তবে যেতে হবে,

কি বলেন ?’

বললাম, ‘তাই ত ভাবচি।’

সে বললে, ‘ভদ্রলোকের ছেলে আমি, তবু আপনার কাছে বলতে আমার বাধবে না, যদি কখনো দিন পাই আপনার দেনা আমি শোধ করব। ফিরে আর যাবো না, পথে যেন উপবাস না করতে হয়, এই আপনার কাছে প্রার্থনা। ফিরে আর আমি যাবো না দাদা।

‘কত দুঃখে যে এসেচি সে আপনাকে কী বল্‌ব! ছ’শো মাইল পথ হেঁটে একদিন হরিদ্বারে এসে পৌঁচেছিলাম···আর কোনো সাধ নেই দাদা, বুঝলেন ? একটিমাত্র আশা, মনের মতন একটি মঠ করে যাবো। বহুকাল থেকে বদরী যাবার ইচ্ছে, কতদিন ভেবেছি মনে মনে—’

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললাম, ‘চলুন, যা হবার তাই হবে। ফিরে গিয়ে আর কাজ নেই, উপবাস যদি করতেই হয়, দুজনেই একসঙ্গে করব। চলুন, রাত কাটাবার একটা জায়গা দেখে নিইগে।’

অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ব্রহ্মচারী শুধু বললে, ‘চলুন দাদা।’

অনেক অনুসন্ধান এবং সুপারিশের পর হাসপাতালের পাশে এক যাত্রিশালায় রাত্রিবাসের জায়গা পাওয়া গেল। যাত্রিশালার দালানে জায়গা অতি সঙ্কীর্ণ। অন্ধকারে বসে জনকয়েক গাড়োয়ালী কুলী-মজুর জটলা করছিল, শ্রদ্ধাসহকারে আমাদের জায়গা

ছেড়ে দিয়ে সরে বসল। ভিতরে চেয়ে দেখি, একদল যাত্রী। বাংলা ভাষায় তাদের আলাপ শুনে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, একটি প্রায়-বৃদ্ধ ব্যক্তি অভ্যর্থনা করে বসালেন। সমস্ত ঘর জুড়ে জন পনেরো স্ত্রীলোক এখানে ওখানে ছড়িয়ে শুয়ে রয়েচে। বললাম, 'কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?'

'কালীঘাট থেকে। আপনারা ?'

'আমি আসচি কাশী থেকে, উনি পরিব্রাজক।'

লোকটির এতখানি দাড়ি, যাত্রাওয়ালার মতো মাথায় চুল, পরনে গেরুয়া, গায়ে একটা গরম ওয়েস্ট-কোট, পায়ে পাহারা-ওলার মতো কালো বনাতের ফেট্টিবাঁধা। ছোট্ট একটা কল্‌কেয় তামাক সাজছিলেন। বললেন, 'আপনি ?'

বললাম, 'ব্রাহ্মণ,—আহা-হা করেন কি ? আমি যে বয়সে অনেক ছোট !'

'তা হোক, কেউটের বাচ্চা।' বলে তিনি হঠাৎ জোর করে আমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন। বললেন, 'বুড়োমানুষ, এতগুলি মেয়েছেলে নিয়ে এই দুর্গম পথে···একটু দেখবেন দয়া করে। পথের সঙ্গী !'—ঝুলি থেকে দু'টি বিড়ি তিনি আমাদের বা'র করে দিলেন।

তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আবার বাইরে এলাম। আলো জ্বাল্‌বার উপায় ছিল না। অন্ধকারে কম্বল ছড়িয়ে পাশাপাশি দু'জনে শুয়ে পড়লাম। ব্রহ্মচারী হাই তুলে তুড়ি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস

ফেলে তার অভ্যাস-মতো বলে উঠলো, 'ওঁ নমো নারায়ণায় ! ওঁ তৎসৎ।'

বললাম, 'আমরা ত কেউ পথ চিনিনে, যাবো কোন্ দিকে ?'

'একই পথ, দ্বিতীয় নেই। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে চল্‌বো দাদা, ভয় কি ? ওঁ নমো নারায়ণায়।'

অনেক গল্প চললো। অনেক পথের ইতিহাস, কত দেশ, কত রাজ্যের কথা। ব্রহ্মচারীর পথের জীবন বহু দিনের, কিন্তু তার বিপুল অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে তার আত্মোপলব্ধি হয়নি। সে জীবনকে দেখেচে গীতার ভিতর দিয়ে, বেদের কয়েকটা শ্লোকে, মহাভারত ও রামায়ণের কয়েকটা ঘটনায়, ভগবানের প্রতি তথা-কথিত পূর্ণ বিশ্বাসে। ধর্মের আলোচনায় তার হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায়, ধর্মজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রকাশ পাওয়া যায় না। সংসারে সবই সে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়ে এসেচে, দেয়নি শুধু আশা। আশা নিয়ে সে বাঁচে, আশা নিয়ে তার তীর্থ পর্যটন, আশা নিয়েই তার ধর্মজীবন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে শুয়ে শুয়ে তার কথা শুনে চলেচি। সে এক সময় বললে, 'কত জায়গায় আসন পাতলাম, বুঝলেন দাদা, বাঁকুড়ায় জয়নগর আছে জানেন ত, সেই গ্রামের এক গাছতলায় ....তারপর গেলাম বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে সোজা জ্বালামুখী.... উঁহু, সুবিধে হ'লো না—এলাম হরিদ্বারে। এখানেও তাই, সেই ধুনি জ্বালিয়ে মূর্খ সন্ন্যাসীর দল বসে বসে গাঁজা টিপচে, সেই

তাদের ক্ষিধের সময় ক্ষিধে পায়···বিশেষ করে ওই নেশাখোর সন্ন্যাসীর দল আমার ভালো লাগে না। কী হয় ওতে বলুন ত? নেশার চোখেই যদি দুনিয়াকে দেখলাম—'

ক্লান্তি এসেচে শরীরে; চোখ বুজে বললাম, 'তা ত বটেই।'

ব্রহ্মচারী হেসে বললে, 'তবে নিন্দে আমি করিনে দাদা। আমি বলি, নেশাই যদি দিনরাত করলে তবে সাধনার সময় কোথায়? সাধনা চাই, তপস্যা। যে-আসনে বসবে সে-আসনে একদিন আগুন জ্বলে উঠবে, নাক টিপে নাভিশ্বাস······'

বললাম, 'তা ত বটেই!'

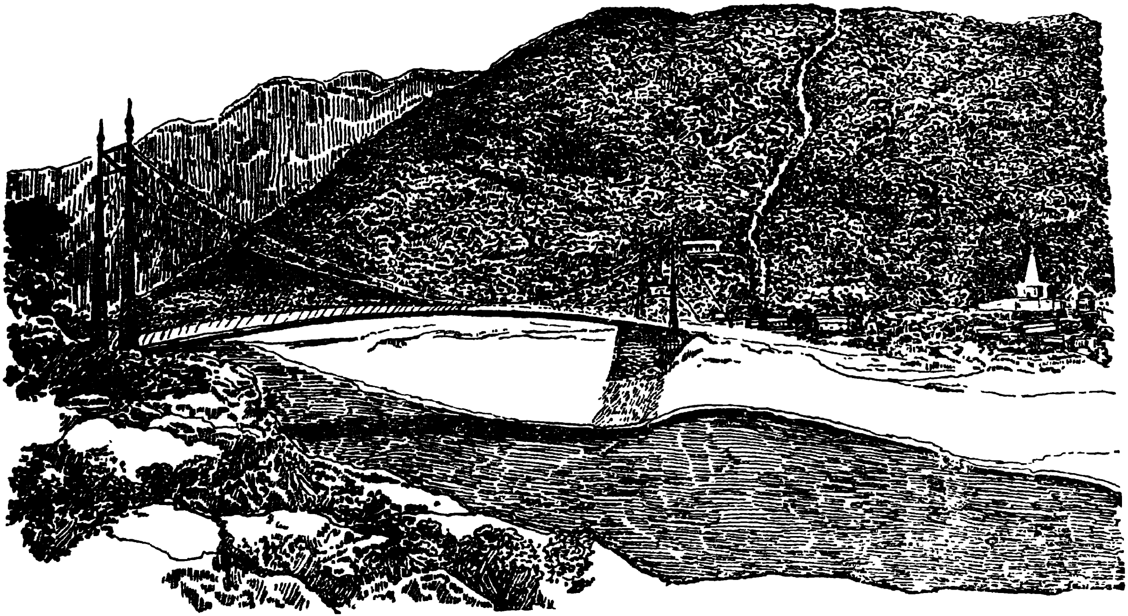
নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি চারিদিকে তখন থম্ থম্ করচে। গঙ্গার জলের শব্দ এতদূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম।

যাত্রা

বৈশাখ ১৯, ১৩৩৯। সেদিন প্রথম আমাদের পদব্রজে যাত্রা শুরু হ'লো। কাঁধে বোঝা আর হাতে লাঠি নিয়ে দুই বন্ধুতে পথে নেমে এলাম। পাথর ও কাঁকরের পথ। বাঁ দিকে দূর পর্বতের চূড়ায় টিহ্‌রীর রাজপ্রাসাদ তাজমহলের ছবির মতো, তারই নীচে দেরাদুনের গভীর অরণ্য। দক্ষিণে প্রভাত-সূর্যের নিঃশব্দ সমারোহ আকাশে-আকাশে প্রসারিত হয়ে চলেচে। প্রস্তরসঙ্কুল শুষ্কপ্রায় চন্দ্রভাগা নদী পেরিয়ে কিছুদূর যেতে এলো মৌনী বন। বনের গায়ে সামান্য একখানি গ্রাম, ভরত-শত্রুঘ্নজীর মন্দির। মন্দির পার হয়ে ধীরে ধীরে চললাম। পাহাড়ের চড়াই শুরু হ'লো, আমাদের গতি হ'লো মন্থর। পাহাড়ের পথে যেতে যেতে গল্প করা চলে না। মুখ যখন বন্ধ থাকে, মন তখন আপন কাজ করে যায়। মাইল-দুই পথ পার হতেই আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হ'লো, নতুন জুতো পায়ে লাগচে, ব্রহ্মচারী চল্‌চে বকের মতো টপ্‌কে টপ্‌কে, বহুকাল পরে তার পায়ে উঠেচে জুতো, জুতো পরার উল্লাসে তার পা দুখানা কথা কইতে কইতে চলেচে। অনেক উঁচুতে উঠে পথ আবার নীচের দিকে নামলো। পার্বত্যপথ আপন ইচ্ছায় যাত্রীদের টেনে নিয়ে যায়। সমতলভূমিতে যেমন আমাদের অবাধ স্বাধীনতা, যেদিকে

খুশি এঁকেবেঁকে চল্‌তে পারি, এখানে তার উপায় নেই, এখানে তুমি পথের অধীন, পথের নির্দেশেই তোমাকে যেতে হবে। ক্রমে জলের শব্দ প্রখর হয়ে উঠলো, বুঝলাম নীচে নেমেচি। আরো কিছুদূর এসে লছমনঝুলা পেলাম, গঙ্গার নীলধারার 'পরে পুল, দু'দিকে লোহার কাছি দিয়ে বাঁধা টানা সাঁকো। বদরীনারায়ণের পথের প্রায় সমস্ত পুলই লছমনঝুলার আদর্শে তৈরী, পার হতে গেলে সমস্তটা দোলে, পুল ছিঁড়ে পড়ে যাবার ভয় হয়, আমোদও লাগে। পুল পার হয়ে কয়েকজন বাঙালী পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো। আমরা বদরীনাথের পথে পা বাড়িয়েচি শুনে তাঁরা বিস্মিত হলেন, শুভেচ্ছা জানালেন, নমস্কার করে বিদায় দিলেন।

সম্মুখে গগনস্পর্শী নীলকণ্ঠ পর্বত, তারই নীচে দক্ষিণে স্বর্গাশ্রমের শ্বেত মন্দির, হাঁসের পালকের মতো সাদা, পদতলে গঙ্গার নীল স্রোতপ্রবাহ। বিদায় স্বদেশ, বিদায় সভ্যতা, বিদায় জনসমাজ! আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, মনে মনে সকলের নিকট বিদায় নিলাম। চোখে আমাদের সুদূরের পিপাসা, অন্তরে উদ্দীপনা ও উৎসাহ, বুকে দুঃসাহসিক পথযাত্রার দুর্জয় আনন্দ। আমরা গৃহবিরাগী, কিন্তু তবু মন ভারাক্রান্ত হয় কেন? কেন এমন করে পা কাঁপে, কেনই বা গলার ভিতরে কী যেন ঠেলে? হয়ত এমনিই হয়! মানুষের এই ছেড়ে চলে যাওয়ার পিছনে আছে একটি অনন্ত বেদনার সুর। এত মায়া, এত মমতা, এত হৃদয়াবেগের



লছমনঝুলা

খেলা, তথাপি ঠিক সময় চলে যেতে হয়, বিদায় নিতে হয়! একদিন হয়ত সকালের এই নির্মল আলো, উজ্জ্বল রোদ চোখ থেকে মুছে যাবে; হয়ত এই আকাশ, এই গঙ্গা, এই পর্বতমালা, ধরিত্রীর চারিদিকের এই মনোরম ঐশ্বর্যসম্ভার হারিয়ে আমি বিদায় নেবো, সেদিনের হয়ত আর দেরিও নেই, সেদিনও এই মরজগতে এমনি করেই চলবে আনন্দকলরব। কিন্তু যে-ক্ষুধা, যে-আশা, যে-স্বপ্ন যাবার বেলায় পথের প্রান্তে ফেলে যাবো তার দিকে কেউ ফিরেও চাইবে না।

কষ্টদায়ক বন্ধুর পথ, প্রস্তরসঙ্কুল, মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে পত্রপল্লবের ভিতর এক-একটা ঝরনার শব্দ শুনতে পাচ্চি। শেষ বসন্তের ঝরাপাতায় পথ আচ্ছন্ন, মানুষের সমাগম প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো, আর সাড়াশব্দ নেই। নতুন জুতো পায়ে লাগচে! পিঠে-বাঁধা কম্বল ও ঝোলার দড়িতে কাঁধ কন্ কন্ করচে, শরীর ক্লান্ত হয়ে এলো। নানা জনের নানা উপদেশ পেয়েছিলাম, কিন্তু সে উপদেশ মাত্র, পথে এসে তার সার্থকতা খুঁজে পেলাম না, খেই হারিয়ে গেল। ঘণ্টা দুই চলবার পর ব্রহ্মচারী শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'আসুন দাদা, একটু বসে যাই, জলতেষ্টা পেয়েচে।'

ছায়াশীতল পথের প্রান্তে দুজনে বসলাম। নীচে নদীর কল-ধ্বনি, বনময় পাহাড়, কাছেই একটি অতি ক্ষুদ্র মন্দির নিভৃত ও প্রশান্ত,—পূজারী আমাদের পানীয় জল দিলেন। জল খেয়ে ব্রহ্মচারী বিড়ি টানতে লাগলো। গল্প করার আর কিছু নেই, কী

গল্পই বা করবো ?—আস্তে আস্তে পা ছড়িয়ে সেইখানে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পরে আবার ব্রহ্মচারী গা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে, 'চলুন দাদা, বেলা হয়ত বারোটা হয়ে গেচে, ক্ষিধে পেয়েচে আপনার নিশ্চয়ই।'

নিশ্বাস ফেলে ঝোলা ও কম্বল বাগিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'ক-মাইল হাঁটা হ'লো ব্রহ্মচারী ?'

পথে মাইল পোষ্ট আছে। ব্রহ্মচারী মনে মনে হিসেব করে' বল্‌লে, 'মাইল পাঁচেক।'

আরো কিছুদূর এসে গরুড় চটি পাওয়া গেল। একখানা বড় ধর্মশালা। নীচে একটি দোকান, দোকানে বেশি দামে সব আহার্যই পাওয়া যায়। ধর্মশালার পাশে সুন্দর একখানি বাগান ও জলাশয়। নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটি খরস্রোতা ঝরনা, তারই জল এই জলাশয়টিতে যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত হয়। চটিতে রান্নার জন্য পিতলের বাসন পাওয়া যায় এই সর্তে যে, চটিওয়ালার নিকট ডাল আটা ঘি চাল ইত্যাদি কিনতে হবে। যারা কিছু কিন্‌বে না, তাদের পক্ষে চটিতে স্থান পাওয়া কঠিন। অনেক চটিতে মাথা পিছু দু'পয়সা দিলেও আশ্রয় পাওয়া যায়। সকল চটিতেই প্রায় এক নিয়ম। এবেলার মতো এখানেই বিশ্রাম, ওবেলায় আবার যাত্রা। চটির দোতলায় তখন বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়েচে। বিশ্রামান্তে দুই বন্ধুতে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হলাম।

এমনি করেই আমাদের যাত্রা। দু'বেলা রান্না, দু'বেলা বাসন মাজা, দু'বেলা পথ হাঁটা। দুপুরবেলায় আহারাদির পর অগাধ নিদ্রা, মাছির তাড়নায় মরা মানুষের মতো আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া; বিকেলবেলা আবার পথ হাঁটতে শুরু করা, সন্ধ্যায় কোনো এক চটিতে আশ্রয় নেওয়া, আহারান্তে জানোয়ারের মতো ঘুম, সন্ধ্যারাতেই ঘুমে অচেতন। চটিগুলো আস্তাবলের মতো, তিন দিক বন্ধ, এক দিক খোলা, গাছের গুঁড়ি ও ডাল পাতা দিয়ে তৈরী, কাঁকর পাথর মেশানো মাটি দিয়ে লেপা, নিতান্ত দরিদ্র ও সামান্য। আমরা যাত্রীর দল গিয়ে সাজপোশাক ছেড়ে গা এলিয়ে দিতাম। ক্লান্তি আর অবসাদে মুখে কথা ফুটতো না।

যাত্রীরা এসেচে নানা দেশ থেকে, কেউ দক্ষিণী, কেউ সিন্ধি, কোনো দল পাঞ্জাবী, খোট্টা, মাড়োয়ারী, উড়িয়া, গুজরাটি, মারহাট্টি,—বাঙ্গালীর দল এদের মধ্যে ছড়ানো। সাধারণ ভাষা উর্দু এবং হিন্দির সংমিশ্রণ। দু'চারজন ছাড়া সকলেরই পায়ে জুতো, বেশির ভাগ জুতোই ক্যাম্বিসের, তলায় রবারের সোল্, এই জুতোই সুবিধা। হাতে একগাছা লাঠি নিতেই হবে, নৈলে শেষ পর্যন্ত পথ চলা অসম্ভব। লাঠিই পথের একমাত্র উপকারী ও নিঃস্বার্থ বন্ধু। অনেক যাত্রী যায় গাড়োয়ালী কুলির পিঠে, কুলীদের অসীম শক্তি। কাণ্ডিওয়ালা তাদের নাম। কাণ্ডিটা একটা ঝুড়ির মতো, পিঠের দিকে বাঁধা থাকে, তাতে মালও যায়,

মানুষও যায়। কাণ্ডির উপরে স্ত্রী-যাত্রীই বেশি সংখ্যায় ওঠে। ডাণ্ডিগুলো ঈজি-চেয়ারের ধরণ, তলায় ডাণ্ডা লাগিয়ে চারজন কুলী কাঁধে তুলে নিয়ে পালকির বেহারার মতো চলে। সম্ভ্রান্ত যাত্রীরা ডাণ্ডি করেই যায়, এইটিই সকলের চেয়ে আরাম-দায়ক। ঝাঁপানও আছে, মড়ার খাটের মতো তার চেহারা, আসনপিঁড়ি হয়ে বসে যেতে হয়, পথশ্রম বাঁচে বটে কিন্তু আরামটুকু নেই। প্রথম-প্রথম যাত্রীরা দলে দলে উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে থাকে, দু'চারদিন ছ'দিনের পর দেখা যায় তাদের গতি হয়েছে মন্থর, কেউ চলচে খুঁড়িয়ে, কেউ হাঁটচে লেংচে, কেউ পড়েচে পিছিয়ে, কেউ রোগাক্রান্ত, কারো এসেচে বিতৃষ্ণা, কেউ গেল ফিরে। প্রথম দিকে যাদের দেখেছিলাম সুস্থ, সবল, প্রফুল্ল ও মিষ্টভাষী, কয়েকদিন পরে দেখা গেল দেহ তাদের শীর্ণ, ধুলোয় ও রোদে মলিন, করুণকাতর দৃষ্টি, পায়ের হাঁটুতে হয়ত ধরেচে ব্যথা, মুখে চোখে অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। কাছে এসে দাঁড়ালে ভয় করে। যাত্রীদের এই অবস্থা কুলীরা বোঝে। তাই যারা বেকার কুলী, তারা পিঠে খালি কাণ্ডি ঝুলিয়ে দিনের পর দিন ধৈর্যসহকারে দলবদ্ধ যাত্রীদের পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দেখা যায় একটি একটি করে তাদের খরিদ্দার মিলচে, তখন তারা গরজ বুঝে বেশি দর হাঁকে, এবং তা দিতে হয়; গরজ বড় বালাই। এ পথে সভ্যসমাজের তো চুরি-ডাকাতি রাহাজানি এসব কিছু নেই, যাত্রীরা এদিক দিয়ে

যথেষ্ট নিরাপদ। কুলীরা বিশ্বাসী, ভদ্র ও সরল। অর্থের প্রতি তাদের মোহ আছে কিন্তু তার জন্য দুষ্প্রবৃত্তি নেই। তারা বিবাদ করবে কিন্তু প্রবঞ্চনা করবে না। তারা দরিদ্র বটে, কিন্তু দারিদ্র্য তাদের হৃদয়কে কলুষিত করেনি। বিত্তহীন, কিন্তু চিত্তহীন নয়।

উত্তরাখণ্ডের গঙ্গার তীরে তীরে আমাদের পথ। এপারে বৃটিশ গাড়োয়াল, বাঁ-দিকে নদী, ওপারে টিহ্‌রী-গাড়োয়াল। করদ রাজ্য, নামেমাত্র স্বাধীন। গঙ্গা, অলকানন্দা ও মন্দাকিনীই সাধারণত সেই রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমানা। গাড়োয়ালীদের গ্রাম কোথাও কোথাও দু'মাইল পর্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা সকলেই অবস্থাপন্ন বল্‌তে হবে। সকলেই চাষী। পাহাড়ী ঢালু জমিতে খাঁজ কেটে কেটে তারা এক আশ্চর্য উপায়ে শস্য উৎপাদন করে—গম, আলু, অড়হর, কপি, সরষে ইত্যাদি। বয়সেযারা যুবক, কিংবা বোঝা বহনে সমর্থ বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়, তারা চৈত্রের শেষে নেমে আসে, হরিদ্বারে গিয়ে যাত্রীদের ধরে, বোঝা পিঠে নিয়ে পাহাড়ে ওঠে। হরিদ্বার থেকে মেহেলচৌরী পর্যন্ত তাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ, এর বাইরে যাবার হুকুম তাদের নেই। মেহেলচৌরী গাড়োয়াল জেলার শেষ সীমানা। পৃথিবীতে কোথাও যে সমতল ভূমি আছে, শহর আছে, রঙ্গালয় আছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, এ তারা ভাবতেই পারে না। রেলপথে যে ট্রেন দৌড়য়, জলে যে জাহাজ ভাসে, মাঠে যে ফুটবল খেলা

হয়—এ তাদের কাছে স্বপ্ন। শীতের দিনে এরা কেমন করে' বাঁচে জানিনে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটাতে হয়। কুলীরা জাতিতে প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, যাত্রীদের সঙ্গে তারা শোয়, বসে, গল্প করে, ভুরা তামাক টানে, কিন্তু তাদের ছোঁয়া তারা খায় না। আহার সম্বন্ধে তাদের বিস্ময়কর শুচিতা। আমিষ-ভক্ষণ তারা পাপ মনে করে। জীবহিংসা তাদের একেবারেই নেই। তাদের মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়েই কেবল বসে থাকে না, তারাও চাষ করে, গৃহপালিত পশুর তদ্বির করে, কম্বল বোনে, জামা কাটে, তেল-ঘি তৈরী করে, পাহাড়ের বন থেকে কাঠ কেটে আনে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পিঠের উপর বেঁধে ভ্রমণে বেরোয়। পথে যেতে যদি কোনো গ্রাম পড়ে, অমনি বয়স্থা মেয়েরা ও বালক-বালিকারা বেরিয়ে এসে যাত্রীদের কাছে হাত পাতে। বলে, 'এ শেঠজি, এ রাণা সুঁই-সুতা দেও, পাই-প্যায়সা দেও, এ রাণা, দে রাণা!'—ছুঁচ-সুতো এবং সিকি পয়সা ছাড়া তাদের ভিক্ষা করবার আর কিছু নেই। যদি পুরো একটি পয়সা পায় ত মহা খুশী, যেন অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য হাতে এলো। ছুঁচ-সুতোয় তাদের অদ্ভুত আসক্তি। এ বস্তুটি গাড়োয়াল জেলায় নাকি মেলে না।

চতুর্থ দিন প্রাতে উৎরাই পথে আমরা ব্যাসঘাটের দিকে চললাম। পর্বতচূড়া থেকে জলধারার মত যাত্রীরা নেমে চলেচে। যখন কোনো নদী পার হতে হয় কিংবা এক পাহাড় থেকে অন্য

পাহাড়ে চড়তে হয় তখনকার পথ উৎরাই। উৎরাই পথে নামবার সময় বিপদ আছে—হোঁচট্ খাওয়া বা পা-পিছ্‌লানোর ভয়! অতি সন্তর্পণে এবং সতর্কতার সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামতে নামতে বিরক্তি ধরে। পায়ের হাঁটুতে জোর লাগে, ব্যথা জমে, শেষ পর্যন্ত পা খারাপ হয়ে যায়। চড়াই পথে উঠতে-উঠতে কোমর-পিঠ-ঘাড় কন্‌কন্ করে, বুকের মধ্যে ব্যাথা ধরে, দাঁতে দাঁতে চেপে মুখের যন্ত্রণা হয়—দূরে চড়াই পথ আছে সংবাদ পেলে আমরা ভীত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই—যেন আসন্ন বিপদ পথে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েচে।

আকাশ সেদিন প্রাতে মেঘে মেঘে মলিন। নয়ার নদী ও গঙ্গার সঙ্গমে হু-হু শব্দে হাওয়া উঠেচে। নূতন এক রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়ে এসেচি। আজ সকাল পর্যন্ত বত্রিশ মাইল পথ হাঁটা হ'লো। সমতল ভূমিতে এইটুকু পথ অতিক্রম করতে আমাদের পরিশ্রম সামান্যই হয়, কিন্তু এ যে পাহাড়—দুর্গম, দুরারোহ, প্রস্তরসঙ্কুল। এ পথের শেষ নেই, বিচ্ছেদ নেই,—একঘেয়ে, যন্ত্রণাদায়ক পথ। নয়ার নদীর পুল পার হয়ে ব্যাসগঙ্গার তীরে এক চটিতে এসে উঠলাম। গতদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েকটা চটি পার হয়ে এসেচি,—নাইমুহানা, বিজনী, বান্দর, শেমালু, কান্দি ইত্যাদি। বান্দর চটিতে সেদিন রাত্রে এক কাণ্ড! নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের দুই বন্ধুকে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ী সাপ সস্নেহে আলিঙ্গন করেছিল, কিন্তু কী সৌভাগ্য, চুম্বন

করেনি ! লাঠির ঘায়ে সাপ মরলো কিন্তু সেই সূত্রে এক পণ্ডিত-জীর সঙ্গে জম্‌লো বন্ধুত্ব। পণ্ডিতজীর বাড়ি মধ্যভারতে বুরহানপুর জেলায়। একা মানুষ, পাকা তীর্থযাত্রী। বছরখানেক থেকে তিনি পরিব্রাজক হয়ে সকল তীর্থ ঘুরচেন। সন্ন্যাসীযোগীর বেশ, তাই রেলওয়ে কোম্পানী তাঁর কাছে কখনো ভাড়া আদায় করতে পারেনি। না পারার কারণও ছিল, তাঁর চতুর ও মধুর আলাপে বনের পশুও বশীভূত হয়। লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে, রোগা ও দীর্ঘ দেহ, কয়েকটা দাঁত নেই, চাতুর্য ও ভগবদ্‌ভক্তির সংমিশ্রিত দীপ্তিতে দুটো চোখ উজ্জ্বল, গলায় ছড়া-চার-পাঁচ রুদ্রাক্ষের মালা, জপে বসে থলিটি খুলে ফোঁটা-চন্দন-তিলক সেবা করেন, মুখে বোল্‌ ছিল 'সীতারাম'। ইতিমধ্যে আমরা দলে একটু পুরু হয়েছি, সেই কালীঘাটের যাত্রীরা এসে মিলেচে। দীর্ঘকেশ, গঞ্জিকাসেবী বৃদ্ধ দাদাটি এসে পৌঁচেছেন, তাঁর পিছনে আছে একপাল বুড়ী। বুড়ীদের উৎসাহ, ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

চারুর-মা'র কোমর ভাঙা, কুঁজো হয়ে চলে, আখের ছিব্‌ড়ের মতো শীর্ণ-কঙ্কাল দেহ, কালীঘাটে দুধ বিক্রি করে খায়; অনেক-গুলি গোরুর মালিক সে। সংসারে তা'র এক মেয়ে, আর কয়েকটি গরু ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়ের নাম চারু।

'শুনছ, অ বা' ঠাউর, ভাতুর যেদিন ছেলে হ'লো····কী বিষ্টি, তেমনি অন্দকার। আমি বলি, আর বুঝি বিউতে পারে না···কিন্তু

কানি, জুম্‌নি, পাগ্‌লি, ওদের বেলা…'

'কি বকিস্ লা চারুর-মা, গজর গজর করে ?'—বামুন-'বুড়ী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এই জন্যে তোকে আন্‌তে চাইনি। গোরুর আদিখ্যেতা শুন্‌তে শুন্‌তে…যদি এতই তোর টান্ তবে এলি কি জন্যে ? আমি মরি শীতের জ্বালায়, আর তুই…দে তোর কম্বল-খানা আমার গায়ে চাপিয়ে।'

'আহা, শোনো না গল্পটা বামুন-মা ? তা'পর, বুঝলেন বা' ঠাউর—?'

'থাম্ থাম্ আ মর্, অবাধ্য মাগি…ছুঁস্‌নি আমাকে, ওইখানে সরে বোস্, ইত্তিজাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার জাতধর্ম আর কিছু রইল না। দেশে গিয়ে প্রাচিত্তির না করলে আর—'

অস্পৃশ্যা চারুর-মা অপ্রস্তুত হয়ে সরে যায়।

দাদার সঙ্গে আছে অমরা সিং। যুবকটি পাণ্ডার লোক, পথ-নির্দেশক হয়ে যাত্রীদের বদরীনাথ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ভার নিয়ে এসেচে। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিছু লেখাপড়াও জানে, দেবপ্রয়াগ থেকে খানিকদূরে পাহাড়ের কোন্ এক গ্রামে তার বাড়ি। বৎসরান্তে অর্থ-উপার্জনের জন্য হরিদ্বারে নেমে যায়। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে তার প্রখর দৃষ্টি—সামান্য বিশ-তিরিশ টাকার জন্য প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল তাকে হেঁটে যেতে হয়। লোকটি ভদ্রবেশী বর্বর নয়, ভদ্রই।

ব্যাসঘাটে প্রকৃতির অপূর্ব প্রকাশ। উদার পর্বতশ্রেণী, মেঘ-

কজ্জ্বল আকাশের ছায়া নেমেচে নদীতে, নদীর প্রস্তর-আবর্তে ঘুরে ঘুরে লক্ষ লক্ষ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেচে স্রোতের কলকল্লোল—দূর-বিস্তার বালির চড়ায় কোথাও কোথাও এক আধজন সন্ন্যাসী জপে বসেচে। ঘনশ্যাম বনরেখা, তার ভিতর দিয়ে ঝরনার শব্দ, একটি অনির্বচনীয় অবকাশ! কিন্তু বিশ্রামের সময় আমাদের নেই। স্বপ্নরাজ্যের শোভা যেমন এক চোখে দেখেচি, তেমনি অন্য চোখে ছিল পথের জ্বালা, অপরিমিত দুঃখ, অসহ্য কষ্ট।

'তুমি কেন এলে বাবা তীর্থ করতে? এই অল্প বয়সে—'

বললাম, 'তীর্থ করতে আমি ত আসিনি!'

'তবে? তবে এলে কেন এই দুর্গমে বাবা? হ্যাঁ গা, অ ছেলে?'

'এমনি বেড়াতে এসেচি বুড়ী-মা।'

'বেড়াতে এসেচ! ও মা কি হবে গো, বেড়াবার কি আর জায়গা পেলে না? বিয়ে হয়নি বুঝি?'

হেসে বললাম, 'বিয়ে হ'লে কি কেউ আসে না এ পথে?'

একজন বললে, 'আহা সে বাবার দয়া! যাকে টানেন সেই—'

বললাম, 'বাবার দয়া যে চায় না সে কেন আসে বুড়ী-মা?'

বুড়ী চোখ কপালে তুলে বললে, 'বাবার দয়া চায় না, এমন মানুষ—সে যে নাস্তিক বাবা!'

মাইল কয়েক রাস্তা গিয়ে কানাঘুষোয় শুনলাম, আমার মতো নাস্তিক নাকি আর ভূ-ভারতে নেই! নিন্দা এলো, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আসতে লাগ্‌লো, আমার প্রতি বুড়ীদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ বিলুপ্ত হ'লো, পথে আমার মতো অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী, নাস্তিক যাত্রীর দেখা পাওয়া মহাপাপ। নতমস্তকে তাদের মন্তব্য মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য গতি ছিল না!

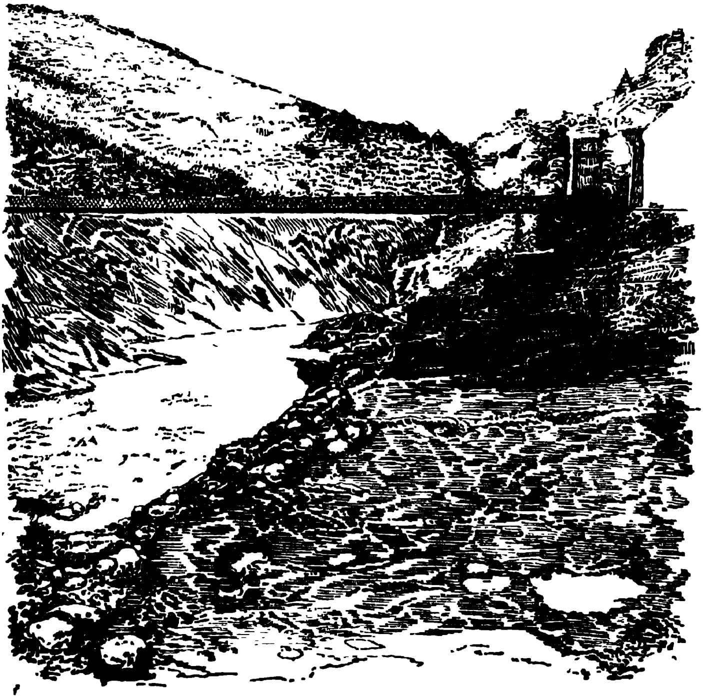
'ও কিছু না, বুঝলে দাদা, ওসব মেয়েমানুষের কথা। পাগলে কী না বলে আর ছাগলে—' দাদা বলেন।

'কী বল্‌লে, আমি ত শুন্‌তে পাইনি!'

'শুন্‌তে না পাওয়াই ভালো! বলে, কানে দিয়েচি তুলে, আর পিঠে বেঁধেছি—, ওসব মেয়েমানুষের কথায় কান দিতে নেই— ওরা ভারি পুণ্যি করতে এসেচে!'

সেদিন বহুপথ অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যায় দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। পথের ধারে বসে' আছেন এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী, নির্বিকার, নির্লিপ্ত; পাশে এক ভক্ত শিষ্য দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে। নবাগত যাত্রী দেখে সে মুখ তুল্‌লো না, বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল। পাশে ধুনি জ্বল্‌চে। একখানা পাথরের উপর খানিকটা কাঁচা ভাঙ্‌ তৈরী করা রয়েছে। ভক্তিভরে তাঁর পায়ের কাছে মিনিট কয়েক নিমীলিত নেত্রে ব'সে এক সময় উঠে সরে পড়লাম। বাস্তবিক সন্ন্যাসীর মতো সন্ন্যাসী বটে!

দেবপ্রয়াগ ছোট একখানি পাহাড়ী শহর। অলকানন্দা এসে



দেবপ্রয়াগ

এখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলেচেন। যেন নীলাম্বরী পরা দুটি যমজ বোন বহুকাল পরে পরস্পারের দেখা পেয়ে গলাগলি করচে। এখানে আছে রামচন্দ্রের মন্দির। শোনা গেল, দেবপ্রয়াগে উত্তর-পুরুষদিগকে আগমন করতে দেখে পূর্বপুরুষরা পিতৃলোকে আনন্দে নৃত্য করেন। ইচ্ছেটা বংশধরগণের হাতে গ্রহণ করেন পিণ্ড, পিতৃলোকে বোধ করি নিত্য দুর্ভিক্ষ। শহরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যায়। গুটিকয়েক ধর্মশালা, কম্বলীবাবার আশ্রম ও দাতব্য ঔষধালয়, ছোট্ট একটি বাজার, একটি বিদ্যালয় ও ডাকঘর।

আজকের মতো যাত্রা শেষ হ'লো। ক্লান্ত মন ও ভগ্ন দেহ নিয়ে অমরা সিংয়ের নির্দেশক্রমে আমরা সবাই এসে একটি ধর্মশালায় উঠলাম। বাঁচলাম, শহর দেখে বাঁচলাম, মানুষের সমাগম এবং লোকালয় দেখে বাঁচলাম।

সামান্য জলযোগান্তে কম্বলশয্যা গ্রহণ করা গেল। পাশে ব্রহ্মচারী, মাথার কাছে বৃদ্ধ দাদা, ওদিকে বুড়ীদের মধ্যে বিড়ালের মতো কোলাহল বেধেচে। কা'র গায়ে কা'র পা ঠেকে গেচে, কা'র মিল্‌চে না পয়সাকড়ির হিসাব, দেশে কে লিখবে চিঠি, কা'র জামাই আস্‌তে মানা করেছিল, মাছির কামড়ে আর চুলকানিতে কা'র পায়ে ঘা ফুটেচে, তারই যন্ত্রণা ও কাতরোক্তি—এমনিতর নানা জটলা। বামুন-মার গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে সেই জটলাকে তীরের ফলার মতো বিদীর্ণ করে' ছুটোছুটি করছিল।

পরম যত্নে ও আগ্রহে কল্‌কেটি সেজে দাদা অন্ধকারে দেশলাইটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জ্বালো দাদা, তুমি না ধরিয়ে দিলে টেনে সুখ নেই।'

ব্রহ্মচারী অনুগত ভক্তের মতো প্রসাদ পাবার ইচ্ছায় গুটি গুটি উঠে বসল। ঘুমের আগে দু'টান না টান্‌লে তার ঘুম আসে না!

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপ হতে লাগ্‌ল। কত তার মনের কথা, কত জল্পনা-কল্পনা। বললে, 'পূর্ণ বিশ্বাস ভগবানে না থাকলে····মঠ যেদিন তুল্‌বো সেদিন আপনি তা'র ভার নেবেন দাদা। মঠ আমি করবই। এখন কিছুদিন চল্‌বে আমার ভিক্ষাবৃত্তি, দরকারের জন্যেই টাকা···যেমন করেই হোক, ছলে-বলে-কৌশলে···'

বললাম, 'ভিক্ষায় পেট চলে, সম্পত্তি করা চলে না।'

ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'তবেই খুলেই বলি আপনাকে, ক'দিন ধরে আপনার কাছে পরামর্শ নেবার জন্য···বলেই ফেলি আপনাকে। গোপালদা কি ঘুমোলেন?'

গোপালদার সাড়া না পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চুপি চুপি সে বললে, 'কিছু টাকা জমিয়েচি দাদা, এই ধরুন হাজার খানেক, এখনো হাজার-দুই টাকা লাগবে অন্তত। ভেবেচি কি জানেন? বাংলা দেশেই যাবো—জল-হাওয়া ভালো এমন এক গ্রামে। দিন-তিনেক আগে রাতের বেলা লুকিয়ে এসে গ্রামের শেষে মাঠে, এক গাছতলায়—'

মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম।

'লজ্জা আর আপনাকে করবো না, বলেই ফেলি', ব্রহ্মচারী লজ্জিত চোখ দুটো নামিয়ে বললে, 'সেই গাছতলায় মাটি খুঁড়ে এক শিবলিঙ্গ পুঁতে সরে পড়বো। তিনদিন পরে সন্ন্যাসীর বেশে যাবো সেই গ্রামে,—বল্‌বো, এসেচি কৈলাস থেকে আদেশ নিয়ে, বটবৃক্ষমূলে হবে বাবার আবির্ভাব, স্বয়ম্ভু মহাদেব, মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এসেচি।'

উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'তবে আমাকেও একটু ঠাঁই দিয়ো ব্রহ্মচারী, আমি তোমার বিজ্ঞাপন প্রচার করবো—দেখো যেন গাছটা বেশ প্রাচীন হয়! প্রাচীনের ভক্ত আমরা ভয়ানক।'

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো। ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন শরীর। মাথা তুলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ঘাড়ে ব্যথা, কাঁধে পিঠে কোমরে ব্যথা, ক্ষত-বিক্ষত পা দুটোর করুণ চেহারা দেখলে চোখে জল আসে; কত যন্ত্রণাই তাদের দিচ্চি; প্রভুভক্ত পা দু'খানা পীড়ন সয় অথচ প্রতিবাদ করে না।

উঠে বসলাম। আড়ষ্ট শরীর, দেহের উপরে যেন লাঠালাঠি হয়ে গেচে। আজ সকলের চেয়ে বড়৹ আনন্দ, পথ হাঁটতে হবে না।

নির্মল রৌদ্রে চারিদিক ভেসে গেচে, স্নিগ্ধ হাওয়া বইচে। আকাশ কোমল নীল, কোথাও কোথাও শাদা পালকের মতো

টুকরো মেঘ পদচারণা করে' বেড়াচ্চে। তাদেরই মাঝে মাঝে স্পর্শ করচে পর্বত-চূড়াগুলি, সেই চূড়ার গায়ে ঘন সবুজ অরণ্যের উত্তরীয়, বাতাসে থেকে-থেকে সে উত্তরীয় আকুল হয়ে উঠচে।

গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে যাত্রীর দল বসে' গেল শ্রাদ্ধ ও তর্পণে, গোপালদা ও ব্রহ্মচারী-প্রমুখ বুড়ো-বুড়ার দল মস্তক মুণ্ডন করলো। পাণ্ডা পড়ালেন মন্ত্র, পিতৃপুরুষ এসে ভক্ত উত্তর-পুরুষগণের হাত থেকে আটার গোলা খেয়ে বোধ করি পরিতৃপ্ত অন্তরেই অদৃশ্য হ'লেন! সকল প্রয়াগেই শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করতে হয়,—শাস্ত্রের আদেশ।

অনেক বেলায় রান্নাবান্নার আয়োজন সেরে অলকানন্দায় স্নান করে' এলাম। ব্রহ্মচারী এ-বেলা রামচন্দ্রজীর প্রসাদ পাবে, আমার কাছে তার আহার নেই, গেচে মন্দিরে। জোগাড় করে' নিয়ে বসেচি, এমন সময় গোপালদা বললেন, 'টাকার ভাঙানি পেলুম না, আনা-চারেক পয়সা দাও ত দাদা, দোকানের হিসেবটা মিটিয়ে ফেলি। আবার দেবো'খন!'

কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে চোখে জ্বালা ধরেছিল, জল পড়ছিল, বললাম, 'দিই, একটু দাঁড়ান।'

রুমালে বাঁধা টাকা-পয়সা ট্যাঁকেই থাকে, দিনরাত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। পয়সা বা'র করতে গিয়ে দেখি, ট্যাঁক খালি, রুমালের চিহ্নও নেই! তার মানে! তার মানে কী! চারিদিকে একবার তাকালাম, মনে হ'লো নিজের মুখের চেহারাটা এক

নিমেষের মধ্যে বিকৃত হয়ে এলো। উঠে ঝোলাঝুলি হাঁট্‌কে দেখলাম, কম্বলখানা ঝাড়লাম, জামার পকেটগুলো তন্ন তন্ন করে' খুঁজলাম। গলার ভিতরে কী যেন ঠেলে উঠে আসতে লাগ্‌লো, বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাট-পড়ার মতো এক রকম শব্দ শুরু হ'লো। চীৎকার করে' ওঠবার চেষ্টা করলাম, আওয়াজ বেরুল না। ছুটে পালাবার ইচ্ছা হ'লো, কিন্তু কোথা যাবো ? সর্বনাশ, এ কী হ'লো ভগবান ?

কুকুরের মাথায় হঠাৎ আচমকা লাঠি মারলে সে যেমন ওলোট-পালট খেয়ে পাগলের মতো অল্প একটুখানি জায়গার মধ্যে ঘুরতে থাকে, তেমনি কিয়ৎক্ষণ হতচেতন হয়ে ধর্মশালার মধ্যে ঘুরলাম। সবই আছে,—কম্বল আছে, ঝোলা আছে, লাঠি-ঘটি আছে, নেই শুধু সেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। আমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পথশ্রম ও তীর্থযাত্রা, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধ, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা, সকলের মূলে যে রয়েচে সেই ময়লা-রুমালে-বাঁধা টাকা-পয়সাগুলি, একথা প্রথমেই আমার মনে এলো। আমার প্রাণের রস একটি নিমেষে কে যেন নিংড়ে নিল, দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত নেই, সর্বাঙ্গ বরফের মতো শীতল, চেতনাহীন—আমার ঘটেচে অপমৃত্যু। নিজের ভয়াবহ পরিণামের কথা মনে করে' নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। এ পথে কারো সহানুভূতি নেই, মমত্ববোধ নেই,—যেটুকু আছে তা নিতান্ত মৌখিক,—স্নেহহীন পুণ্যলোভী যাত্রীর দল

উদাসীন হয়ে ফেলে চলে যাবে,—আজ থেকে যে চিরদিনের জন্য এই দুর্গমে নির্বাসন ! সমস্ত পাহাড়গুলো রাক্ষসের মতো তেড়ে এসে সুমুখে বিকটভাবে নৃত্য করতে লাগলো !

'কই দাদা, দিন্ ভাই একটু তাড়াতাড়ি ।'

বললাম, 'আমারো ভাঙানো পয়সা নেই গোপালদা, টাকা ভাঙাতে হবে ।'

'তবে বাজারেই যাই, ভাঙিয়ে আনিগে। এদেশে টাকা ভাঙানো পাওয়া দেখচি ভারি কঠিন।' বলে গোপালদা বেরিয়ে গেলেন ।

বুড়ীগুলো ওদিকে খেতে বসেচে। আমার উনুনে আগুন নিবে ধোঁয়া হতে লাগলো, সহস্র সহস্র মাছিতে চারিদিক ছেয়ে গেচে, খাবারের জিনিসগুলো আর হয়ত নেওয়া যাবে না। তাদের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। নদী মরে গেল, স্রোত গেল শুকিয়ে, চারিদিক ধূ-ধূ করচে, ছায়া নেই, চোখে আর আলো নেই, আনন্দ নেই, আকাশ হয়েছে বিষাক্ত, সমস্ত প্রকৃতির চেহারা দেখতে দেখতে মলিন হয়ে উঠলো। আমি সন্ন্যাসী নই, পূর্ণ বিশ্বাস ভগবানে আমার হয়নি, বাবা বদরীনাথের দয়ার আশা করে' পথে আমি পা বাড়াইনি, দেবতার উপরে ভরসা আমি করিনে ; আমার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, নিজের জীবন সকলের চেয়ে আমার প্রিয়। দারিদ্র্যে, দুঃখে, হতাশায় আমি বেদনা পাই, সর্বস্ব লুণ্ঠিত হ'লে বিপদ্গ্রস্ত

হই, গ্রহবৈগুণ্যে বিধাতার অভিশাপ মাথায় নেমে এলে চোখে এখনো জল আসে। আমার ভিতরে বৈষয়িক মন আছে, স্বার্থ ও সুবিধার জন্য লোলুপতা আছে। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই ; সমাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, লোভ-মোহ, কলহ-কলঙ্ক-গ্লানি ও মালিন্য—এদের সকলের মধ্যে থেকে গৃহীর মতো জীবন ধারণ করতে যে আমি ভালোবাসি। সর্বশরীর আমার ভয়ে ও হতাশায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। সাহায্য প্রার্থনা করতে গেলে সবাই করবে বিদ্রূপ, সকলের মৌখিক প্রীতির মুখোস খুলে পড়ে সত্যকারের চেহারা প্রকাশ পাবে, সবাই অবজ্ঞা করবে, আমার দুর্ভাগ্যের দিকে ইঙ্গিত করে' মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। তা ছাড়া' যাত্রীরা সঙ্গে আনে জীবনধারণের উপযোগী খরচ, তীর্থ পূজার খরচ ; দরিদ্র পুণ্যকামীর দল, দুঃস্থকে সাহায্য করবার মতো সম্বল ত তাদের নেই। শহরে যারা মানুষ,—পূজারী, পাণ্ডা, দোকানদার,—তারা আসে বছরের এই সময়টায় যাত্রীদের শোষণ করতে, সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের অনন্ত ক্ষুধা তাদের, দান করবার মানুষ তাদের মধ্যে বিরল।

হঠাৎ মনে হ'লো, ব্রহ্মচারী আমার টাকা-পয়সা নেয়নি ত ? উত্তেজনায় চোখ দুটো আমার দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো। এইবার ঠিক ছুঁয়েচি। গতকাল আমার রুমাল সম্বন্ধে সে কা যেন একটা ইঙ্গিত করে' থেমে গিয়েছিল। সে ছাড়া আর কেউ নয় ! এই তার পেশা, এই তার রীতি। কাল রাত্রে তার ভিতরের

ভয়াবহ রূপ দেখেচি, ভণ্ড সাধুর বেশে মানুষকে চিরদিন সে বঞ্চনা করেচে। সাপের মতো তার চরিত্র, শৃগালের মতো তার চক্ষু, শ্যেনপক্ষীর মতো সে সুবিধাবাদী! যে তাকে আশ্রয় দেয় তার ঘরে লাগায় আগুন; বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ—তার টুঁটি টিপে—

'দাদা, কী ভাবচেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?' বলতে বলতে ব্রহ্মচারী পাশে এসে দাঁড়ালো, কাঁধে হাত রেখে ঢেঁকুর তুলে বললে, 'অনেকদিন পরে একটা পান খেতে পেলাম, রুটি আর আলু চিবিয়ে চিবিয়ে মুখখানা খারাপ হয়ে গেচে।'

তার মুখের দিকে তাকালাম। সে পুনরায় বল্‌তে লাগলো, 'এই যে আপনার জন্যে পান একখিলি এনেচি—একি এখনো খাওয়া হয়নি আপনার? চান্ করেননি?'

'চান্? ওঃ—এই যে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, বেশ লাগবে অলকানন্দায় চান করতে, চক্‌চকে জল··· ভারি আরাম।'

ততক্ষণে আমি নদীর দিকে ছুটে চলেচি। পড়ি ত মরি! কিছুদূর এসে বাঁ-হাতি বেঁকতে হয়, তারপর পাথরের খাদ্‌রি-করা সিঁড়ি, নদী অনেক নীচে,—উন্মত্তের মতো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। সুমুখে দীর্ঘ বালির চড়া, দ্রুত চলা যায় না, চারিদিকে ছোট্ বড় অসংখ্য পাথরের খণ্ড ছড়ানো, পায়ে হোঁচট্ লেগে রক্তারক্তি হ'লো—এমনি করে' এলাম জলের ধারে।

বিশেষ একখানা পাথর চিহ্ন করা ছিল, দ্রুত কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে তার তলায় বালির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আঃ, এই যে আমার সোনামণি, আমার সাত রাজার ধন মাণিক, আমার স্বর্গ, আমার বদরীনাথ! আঃ বাঁচলাম, বাঁচলাম! স্নান করবার সময় রুমালসুদ্ধ এর তলায় যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাই কি ছাই মনে ছিল? ধন্যবাদ তোমায় ব্রহ্মচারী, হে খরস্রোতা অলকানন্দা, তোমাকে ধন্যবাদ! আনন্দে আর জ্ঞান রইলো না, আহ্লাদে আর সংযম রইলো না, স্নেহে ভালোবাসায় আবেগে উত্তেজনায় সাশ্রুনেত্রে রুমালখানি মুখে চেপে আদরে-আদরে ভরিয়ে দিলাম।

বদ্‌রীবিশাল কি জয়! জয় বাবা কেদারনাথ!

সমস্ত অগ্রগতির পিছনে থাকে একটি উৎসাহ, প্রাণের বেগ, একটি অনির্বাণ নেশা; কিন্তু এ যাদের নেই তাদেরো অপেক্ষা করা চল্‌বে না, টেনে টেনে এসেচে, ঠেলে ঠেলে যেতে হবেই, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন, ভিতর থেকে প্রতি মুহূর্তেই একটা প্রতিজ্ঞা ঠেলে উঠচে—কেনই বা যাবো না? চল্ চল্—থাক্ পিছনে জীবন, থাক্ মৃত্যু, থাক্ আমার সকল চাওয়া-পাওয়া,—চল্! গৌরীশঙ্কর সীতারাম! জয় বদরী-বিশাললাল কি জয়!

'মহারাজ-জি?'

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। কৌপীনধারী চিম্‌টে হাতে এক সাধু

হেসে বল্‌লে, 'সীতারাম মৎ বোলো, রাধেশ্যেয়ামকো নাম লেও। সীতারাম কহোগে, চিম্‌টি বাজায়কে চলোগে, আওর রাধেশ্যেয়াম কহোগে, ঘর্‌মে বৈঠ্‌কে রহোগে—হাঃ হাঃ হাঃ, চলো ভাই চকাচক্‌।'

রিক্ত ও নিঃস্ব সাধুজী পরম স্ফূর্তি এবং আনন্দে গদ্‌গদ্‌ হেসে ওলোট-পালট খেয়ে চল্‌তে লাগলো ; নিজেকে সে জয় করেচে।

তপোলোকে এ-ক'দিন ভ্রমণ করেচি, এবার পদার্পণ করলাম দেবলোকে। বাঁ দিকে নীচে এবার নতুন নদী, দক্ষিণবাহিনী অলকানন্দা, গঙ্গার মতোই তার স্রোতের শব্দ, নীল নির্মল প্রবাহ ; জলের অবিশ্রান্ত আওয়াজে নীরবতা আরো গভীর হয়ে উঠেচে,—চড়াই পথে আমরা চলেচি উত্তরদিকে। ক্রমাগত উত্তরদিকেই আমাদের গতি, মহাযোগীর জটাকে স্পর্শ করবার জন্য নিরন্তর তার দেহ বেয়ে উঠচি যত পিপীলিকার দল। তীর্থের এই দীর্ঘ পথটিই আমাদের তপস্যা, পথ শেষ হলেই সকলের ছুটি। জীবনেও এমনি, অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতিই আমাদের বাঁচা, আমাদের সাধনা ; পরম পরিণামকে স্পর্শ করতে আমরা এগিয়ে চলেচি, কোথায় গিয়ে পৌঁছবো জানিনে।

কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য ! আজ সকাল থেকে হাঁটুর মধ্যে কেমন একটা ব্যথা খচ্‌ খচ্‌ করছিল, এ-বেলা সেটা বেড়ে উঠলো। উঁচু নীচুতে যাদের হাঁটা অভ্যাস নেই, শুনলাম, এ-ব্যথাটা তাদের সহজে আশ্রয় করে। পায়ে হেঁটে বদরীনাথ যাবার পক্ষে এই

ব্যাথাটাই সকলের চেয়ে বড় বাধা, এর কথা নাকি অনেকেই জানে। চড়াই পথে ওঠবার সময় এ ব্যথাটা জন্মায়, উৎরাই পথে নামবার সময় হয় এর প্রতিক্রিয়া। ভয় পেয়ে গেলাম, এবং সে যে কী ভয় তা আজ আর লিখতে বসে বোঝাতে পারবো না। আস্তে সন্তর্পণে পা মচ্‌কে চলেচি, আর সবাই গেল এগিয়ে, গোপালদা ও ব্রহ্মচারী চোখের আড়াল হয়ে গেল। কেনই বা যাবে না ? যে রুগ্ন ও অশক্ত, সুস্থ মানুষ তার সঙ্গে সহযোগিতা করে' আপনাকে পঙ্গু করবে কোন্ যুক্তিতে ? আমার সঙ্গে কিসের বন্ধন তাদের ? কিসেরই বা ঋণ ? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেচি, শুনেচি আত্মবিস্মৃতিতে ব্যাধির খানিকটা উপশম হয়। নানা অবস্থায় আত্মহারা হওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হবো কেমন করে ? যাকে ভুলে যাওয়ার দরকার তাকেই যে মনে পড়ে সকলের আগে ! অথচ আয়না থাকলে দেখতাম কী দুরবস্থাই শরীরের হয়েচে ! ধুলোয় ও রোদে মাথার চুলগুলো খড়ের মতো রং-চটা, বিবর্ণ ও রক্তহীন, কোটরগত ক্ষীণ দৃষ্টি, হাত-পা-গুলো কুৎসিত ও কাঙাল, কাঠের আগুনের আঁচ লেগে দুই হাতের লোমগুলো পরিষ্কার হয়ে গেচে, জামা-কাপড়ে ও মাথার চুলের মধ্যে উই-পোকার মতো একরকম যন্ত্রণাদায়ক পোকা ভিড় করেচে ! তাদের অশ্রান্ত উৎপীড়নে রাতে ও দুপুরে নিদ্রা নেই, একবার তাড়ালে আবার কেমন করে' এসে আশ্রয় করে। এদের সঙ্গে রয়েচে মাছির প্রচণ্ড উপদ্রব, লক্ষ লক্ষ মাছি,

কোটি কোটি মাছি, সব মাছিময়, মাছির সমুদ্র! মাছির কামড়ে হাতে পায়ে ঘা ফোটেনি এমন যাত্রীই ছিল না। জলের উপরেও যে মাছি পড়তে পারে এ দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম।

লাঠির উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বিষ্ণাকুঠিতে এসে পৌঁছলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েচে। পাশেই একটা কদলীবন, শুক্ল পঞ্চমীর জ্যোৎস্না কলাগাছের চওড়া পাতাগুলির উপরে নেমে এসেচে, রূপোর পাতের মতো ঝলমল করচে, অন্ধকারে অলক্ষ্য অলকানন্দার ঝর ঝর শব্দ কানে আসচে,—চারিদিকে প্রকৃতির একটি রোমাঞ্চকর বসন্ত-শোভা। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ব্রহ্মচারী রুটি সেঁকার আয়োজন করতে লাগলো। আগে কোনক্রমে জল গরম হ'লো, তাতে নুন মিশিয়ে পায়ে মালিশ করতে বসে গেলাম। যে-দেশে যে আচার,, নুন আর গরম জলের মতো পায়ের ব্যথার ওষুধ নাকি আর ভূ-ভারতে নেই! ব্রহ্মচারী বললে, 'আপনার ব্যথা আমি ভালো করে দেবোই, এ ওষুধে যদি না সারে ত আর একটা আমার জানা আছে।'

রন্ধন, ভোজন ও শয়নে সে-রাত কাটলো। ভোর রাত্রেই আবার যাত্রা! বুড়ীরা নাস্তিক ও ধর্মত্যাগী বলে' সম্পর্ক ছিন্ন করেচে, আমার প্রতি আর তাদের সহানুভূতি নেই। কোমরভাঙা চারুর-মা শুধু সবাইকে লুকিয়ে চুপি চুপি বলে গেচে, 'তা বলে আমি তোমাকে ছাড়চিনে বা'ঠাউর, আমি আছি তোমার পায়ে পায়ে। কালীঘাটে চক্কোত্তির ঘরে আমি তিন পো করে' দুধ দিই,

টাকাকড়ি অবিশ্যি চারুই রাখে-ঢাকে…হ্যাঁ, তাদের ঘরে তোমার মতন একটি ছেলে আছে…আহা, যেদিন আমার নিবারণ মরে গেল, ওই একটি ভাইপোই ছিল—সেই বছরেই দুধ দুইতে বসে হাব্‌লি পা ছুঁড়ে আমার হাঁটু ভেঙে দ্যায়, হাব্‌লির পায়ে দড়ি বাঁধা ছিল না। ওমা, যাই, আবার ওরা ধমক দেবে…পায়ের ব্যথাটা কমেনি একটু বা'ঠাউর ?'—এই বলে চারুর-মা লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেছল। বুড়ীর বয়স সত্তর পার হয়ে গেচে।

আস্তে আস্তে চলেচি, আজ অনেকদূর পথ যেতে হবে, আজ আর ক্ষমা নেই। আমি সাধারণত যেতাম সকলের আগে এগিয়ে, এবার থেকে তা আর হবে না, এবারে থাকতে হবে পিছিয়ে। গোপালদা গেচেন বুড়ীদের নিয়ে, ব্রহ্মচারীও কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে এসে তারপর এগিয়ে গেচে, পিছনে যে পাঞ্জাবী ও বিহারী হিন্দুস্থানীর দলটা আসছিলো, তারাও সস্নেহে আমার পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পিছনে আর কেউ যে আছে তা মনে হচ্চে না। সকলেরই মনের কথা, আগে চল্ আগে চল্ ভাই। আজকে পথ বড় দুস্তর ও দুর্গম, কোথাও কোথাও নদীর কিনারায় পথ ধ্বসে গেচে, কোথাও কোথাও পাথরের চাঁই বিপজ্জনক অবস্থায় পাহাড়ের গায়ে সামান্য ভিত্তির উপরে আট্‌কে রয়েচে, একবার পিছ্‌লে পড়লে অসাবধানে অন্তত জন দশেক

যাত্রীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঝোলাঝুলি আর এই কম্বলের বোঝা বইতে পারচিনে, কাঁধ কন্‌কন্ করচে। নিজেকে টেনে নিয়ে চলতেই কষ্ট হচ্চে, বোঝা বইবো কেমন করে ? সামান্য এক সের ওজনের জিনিস এই দুর্গম পথে বহন করা কঠিন, বিরক্তিকর ও শ্রমসাধ্য, আমার আছে অন্তত সাত সের ওজনের ঝুলি ও কম্বল। যাত্রার আনন্দ নেই, শরীর অচল, পা পঙ্গু, আহারের কৃচ্ছসাধন, জুতোর কামড়ে পায়ে বড় ফোস্কা, সর্বাঙ্গে অহরহ পোকা কামড়াচ্চে, নিরুৎসাহ মন, পুণ্যসঞ্চয়ের স্পৃহা নেই—এদের ভিতর দিয়ে কেনই বা যাওয়া ? অথচ প্রায় আশী মাইল পাহাড় এমনি করেই ত পার হয়ে এলাম !

অস্ফুট একটা আর্তনাদে ফিরে চাইলাম। পথের প্রান্তে একখানা পাথরে হেলান্ দিয়ে দুইজন পুরুষ-যাত্রী বসে বসে হাঁপাচ্চে। বুঝলুম পীড়িত, চল্‌তে পারচে না। ব্যস্ ওই পর্যন্তই। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে' এগিয়ে যাচ্ছিলাম, একজন হাত নেড়ে ডাকলো। ডাকলেই কিছু আর কাছে যাওয়া যায় না, বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কহো, কেয়া বোলতা ?' কী যেন সে বিড়বিড় করে বললে, ঠিক বোঝা গেল না কোন্ জাতি। অবশেষে একজন উঠে এসে আমার লোটাটা ছুঁয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলো, জল আছে কিনা। জল অল্পই ছিল, রোগীর মুখে একটু ঢেলে দিয়ে আবার চললাম। বোধ হয় পিছন থেকে একটু আশীর্বাদ করলো কিন্তু ভাষাটা বোধগম্য হ'লো

না। তার আশীর্বাদের মূল্য আমার কাছে এক কানাকড়িও নয়, পায়ের ব্যথা না সারলে বিশ্বসংসারকে আর আমি সুদৃষ্টিতে দেখতে পারবো না।

'কি দাদা, বড় কষ্ট হচ্চে? অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন, এখানে একটু বসেছিলাম আপনার অপেক্ষায়। এই—আর একজন সঙ্গী পাওয়া গেচে।'

মুখ তুললাম। দেখি, একটি লম্বা-চওড়া কৃষ্ণকায় বাঙালী ভদ্রলোক একখানা পাথরের উপরে বসে বিড়ি ফুঁক্‌চেন। নমস্কার বিনিময় করে' তখনই সামান্য আলাপ হ'লো। কথায় কথায় জানা গেল তিনি একা নন, স্ত্রী এবং শাশুড়ী আছেন সঙ্গে, তাঁরা কয়েক পা এগিয়ে গেচেন, দশ মাইলের বেশি রোজ তাঁদের পক্ষে হাঁটা কঠিন। লোকটির নাম অঘোরবাবু। তিনি বললেন, এত করে' মশাই বললুম কাণ্ডি কিংবা ডাণ্ডিতে ওঠো, কতই আর খরচ, কিন্তু কিছুতেই না, মেয়েমানুষের গোঁ বড় ভয়ানক, রাস্তার মাঝখানে অবাধ্য হওয়া আমি ভালোবাসিনে। হবেই ত, পায়ে ব্যথা ত ধরবেই।'

বললাম, 'ডাণ্ডিতে উঠবেন না কেন?'

'পুণ্যি হবে না, তাই জন্যে! হেঁটে গেলে বাবার দয়া বেশি করে পাওয়া যায়।'

ব্রহ্মচারী বললে, 'আহা, তা সত্যি। ওঁ নমো নারায়ণায়! ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস না নিয়ে চল্‌লে···আসুন আপনারা, আমি

ততক্ষণ এগোই।'—ব'লে সে ঝোলাঝুলি নিয়ে লাঠি ঠুকে চলতে লাগলো।

অঘোরবাবুর বাড়ি কলকাতায়। কাজ-কারবার আছে, এখন ব্যবসার বাজার মন্দা। স্ত্রীকে নিয়ে প্রায়ই তিনি তীর্থভ্রমণে বেরোন। কি ভাগ্যি, ছেলেপুলে নেই! বললেন, 'আপনারা ত সন্ন্যিসী মানুষ, সংসারের জ্বালা নেই। আচ্ছা, বলতে পারেন, ব্রহ্মচারীটি কেমন লোক? শুনলুম আপনি ত ওকে খাওয়াতে খাওয়াতে আনচেন! ও লোকটা কী? ভণ্ড-টণ্ড নয় ত?'

বললাম, 'ভণ্ড হ'লেই বা ক্ষতি কি আমাদের বলুন? সবাই সাধু হ'লে বিপদও আছে!'

'তাই বলচি, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করচি। আমার কাছে অনেক দুঃখ জানাচ্ছিল, কিছু সাহায্যও চাইলো, পয়সাকড়ি ত আর দিতে পারবো না, না-হয় এ-ক'টা দিন খেতে দিতে পারি।'

'ও, বেশ ত!' বললাম, 'পথে খেতে দেওয়াটা ত কম নয়!'

'হ্যাঁ, তাই বল্‌চি, মানুষকে চেনা দুষ্কর কিনা। একবার একটা খোট্টা চাকর রেখেছিলুম। ব্যাটা বিনা-মাইনের চাকরি করতে এলো,—বেশ থাকে মশাই, হঠাৎ একদিন পালালো, বাক্স খুলে দেখি গয়নাগুলোও তার সঙ্গে পালিয়েচে। পরের গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার দিতুম, কী ভয়ানক বিপদ বলুন ত?'

হেসে বললাম, 'মাইনে না দেওয়ার বিপদ!'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক বোধ হয় খুশী হলেন না, কিন্তু আত্ম

সংবরণ করে' বললেন, 'তাই বটে, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে-গেল।'

আলাপ করতে করতে রামপুর চটিতে এসে পৌঁছলাম, এর আগে ছেড়ে এসেচি রাণীবাগ। সুমুখে একটা মস্ত বড় ঝরনা নেমে এসেচে, আশপাশে খানকয়েক চটি। পথের ধারে বড় চটির কাছাকাছি অঘোরবাবুর স্ত্রী ও শাশুড়ীকে দেখা গেল। পথশ্রমে দুজনেই ক্লান্ত ও মলিন, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো মেয়েটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুখে কেমন যেন কমনীয় শান্তশ্রী। ব্রহ্মচারী পাশেই ছিল দাঁড়িয়ে, সোৎসাহে বলে উঠলো, 'দাদা, এই দেখুন, এই আমার মা, অন্নপূর্ণা মা, আর ইনি আমার দিদিমা।' বলে সে পাশের বৃদ্ধাটিকে দেখিয়ে দিল।

স্মিতমুখে তাঁদের দিকে তাকালাম বটে কিন্তু আলাপ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। বললাম, 'আমাদের জন্যে কোন্ চটি ব্যবস্থা হয়েচে ব্রহ্মচারী ?'

'এই চটি, এইটেই ভালো দাদা,—ওই যে গোলাপদাও এসে উঠেচেন।'

'বেশ বেশ, আগে একটু বসে পড়ি, পায়ে বড় লাগচে।'—সমস্ত শরীরে তখন যন্ত্রণা হচ্চে।

আমার ঔদাসীন্য দেখে অঘোরবাবু বোধ করি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, অথচ বলবারই বা কী ছিল ? হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এখানে দুধ পাওয়া যায় না ? আমার কাছে চা চিনি আছে,

একটু চা খেতুম।’

চায়ের সন্ধানে তিনি চলে গেলে বউটি স্নিগ্ধ হেসে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনারো কি পায়ে ব্যথা ধরেছে?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, ভারি জব্দ হয়েচি।’

বৃদ্ধা বললেন, ‘যাক্, রাধারাণীর ব্যথার সঙ্গী জুটলো। আমার মেয়েরো পা-টা খারাপ হয়েচে বাবা!’

‘তাই নাকি, বেশ বেশ। ব্রহ্মচারী, তুমি আমার দিকে এবেলা খাবে না ত?’

ব্রহ্মচারী সরে এসে মাথা চুল্‌কে বললে, ‘সেই কথাই বল্‌ছিলাম আপনাকে, মা অন্নপূর্ণার প্রসাদ পেলেই আমার চল্‌বে দাদা, আপনি ত যথেষ্টই খরচপত্র করেচেন আমার জন্যে। এবার থেকে এঁরাই—’

‘বেশ বেশ—’

‘আমি আপনার রেঁধে দিই দাদা?’

‘না, রাঁধতে আমার কষ্ট নেই।’

এতক্ষণে গোপালদার দেখা পেলাম। তিনি একপাশে বসে’ আনন্দে তামাক সাজছিলেন। চুপি চুপি বললেন, ‘বড় ঘরের মেয়ে, কি বলেন? আহা, কেনই যে কষ্ট করে এলেন! সুখ বুঝি সইলো না। নিন্ ধরুন কল্‌কেটা, দেশলাইটে জ্বালি।’

পাশাপাশি সবাই রান্না করতে বসলাম। অঘোরবাবু ছুরি দিয়ে আলু কুট্‌চেন, ব্রহ্মচারী কোথা থেকে মশলা সংগ্রহ করে’

পাথরে পিষতে বসেচে। তবু, উৎসাহ যে আর কিছুতেই নেই তা বেশ বোঝা গেল। মা-মেয়ে আধমরা হয়ে বসে পড়েচেন, মনে হচ্চে আর তাঁদের উত্থানশক্তি নেই, সর্বাঙ্গ তাঁদের ধূলি-ধূসর, লজ্জাকর মলিন বসন, মাথার চুলে এরই মধ্যে প্রায় জটা ধরেচে, যেন মৃতের সৎকার করে শ্মশান থেকে ফিরলেন। অথচ কেই বা কার দিকে তাকায়? যে দিকেই চোখ ফেরানো যায়, কেবল ক্লান্তি, পথের পীড়ন, অপারগ দেহ, অবসন্ন মন। এরই মধ্যে জনকয়েক স্ত্রী-পুরুষ হাঁট্তে না পেরে চড়া দাম আর নাক-খৎ দিয়ে কুলীর পিঠে কাণ্ডিতে উঠেচে! খিদিরপুরের মাসির পা উঠেচে পেকে, কাণ্ডিতে উঠতে-নামতে তার কাতরোক্তি শুন্‌লে ভয় করে। মনসাতলার নির্মলা ত অনাহারে প্রায় মরতে বসেচে। পথ হেঁটে রান্নার উৎসাহ তার আর থাকে না, জল আর চিনি দিয়ে আটা গুলে খায়, কিন্তু পেটে তা সইবে কেন, অতএব ফল ফলতে শুরু করেচে। এ ছাড়া মাছির কামড়ের চুলকানি, চুল্‌কে চুল্‌কে কেউ-কেউ পাগল হয়ে ছুটোছুটি করচে। মনে হয় ঝরনার জলে দোষ আছে। পাহাড়ের নানাজাতীয় লতাপাতা ধুয়ে যে ঝরনা নেমে আসে, তার জল ব্যবহার করাও নিরাপদ নয়।

কি আশ্চর্য জল-বাতাসের গুণ। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর মৃত দেহগুলি আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। রান্না-বান্না, জটলা, গাল-গল্প, পরচর্চা,—আবার আসে উৎসাহের জোয়ার। আহারাদির পর সবাই বাসন ধুয়ে চটিওয়ালার সঙ্গে হিসাব করতে বসে

যায়। এক বেলায় মোটামুটি একজনের আনা-চারেক খাই-খরচ পড়ে। কিন্তু যেখানে জিনিসপত্র দুর্মূল্য সেখানে ছ’-আনার কমে উদরপূর্তি হয় না। ঘৃত ও দুগ্ধ সম্বন্ধে যারা ব্যয়সঙ্কোচ করে, তাদের শেষ পর্যন্ত শয্যাগত হবার সম্ভাবনা। স্বহস্তে প্রস্তুত ছাড়া আর কিছু আহার করা এ পথে নিতান্তই বিপজ্জনক। প্রতি বৎসর আহারাদির অত্যাচারে কত যাত্রী যে অকর্মণ্য ও অচল হয়ে মৃত্যু-কবলিত হয় তার আর ইয়ত্তা নেই।

‘কী যে কষ্ট এদের, দেখলে আমার কান্না পায়। বেঘোরে জীবন দিতে এরা কেন যে আসে!’

বউটির গলার আওয়াজ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। কণ্ঠের কারুণ্য ও আন্তরিকতায় প্রথমে কেউ উত্তর দিল না, কিন্তু তার-পরেই অঘোরবাবু উত্ত্যক্ত হয়ে বললেন, ‘তুমিই বা এলে কেন? ঘরে বসে পূজো করলে পুণ্যি হ’তো না?’

‘মরণ হয়েছিল আমার, পথ যে এমন তা কে জানতো?’

‘তবে চুপ করে থাকো, বাজে বক্ বক্ ক’রো না।’

শাশুড়ী বললেন, ‘বত্তিনারাণ আমাদের পথ ভুলিয়ে আন্‌লো বাবা, ব্যাটা শঠ, আমাদের দোষ নেই।’

অত ক্লান্তিতেও বউটির মুখে হাসি এলো। কিয়ৎক্ষণ পরে বললেন, ‘আচ্ছা, পায়ের ওষুধের কোনো খোঁজ পেয়েচেন? ভারি যে বিপদ হ’লো!’

বললাম, ‘শ্রীনগরে শুনলাম হাসপাতাল আছে, দেখা যাক্।’

'আপনার ত দেখচি ডান্ পা-টা খারাপ হয়েচে, আমার কিন্তু বাঁ-পা। ওঠবার সময় তবু সহ্য হয়, কিন্তু উৎরাইয়ে···ওরে বাবা, হাঁটু ভেঙে পড়ে, চোখে জল আসে। লাঠির উপর জোর দিয়ে ডান্ হাতটা আজ আর নাড়তে পারচিনে—আচ্ছা, একটা কথা বলবেন?'

মুখ তুললাম। তিনি অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তখন থেকেই ভাবচি,—আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দের কোনো আত্মীয়?'

'আজ্ঞে না।'

আবার কিছুক্ষণ নানা গোলমালে কাট্‌লো। আহারের উদ্যোগ করচি, এমন সময় বউটি চুপি চুপি কী যেন অঘোর-বাবুকে অনুরোধ করলেন। স্বামী বললেন, 'কি আশ্চর্য, তুমি বলতে পারো না, এ ত তোমারই বলবার কথা!'

তিনি পুনরায় সরে এসে দাঁড়ালেন।

মুখ তুলবার আগেই এই স্নিগ্ধ, দীপ্ত ও সম্ভ্রান্ত মহিলাটি তাঁর স্বাভাবিক কোমল লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সবিনয়ে বললেন, 'পথে আমগাছ দেখে কাঁচা আম পেড়ে এনেছিলুম, চাটনি তৈরী করেচি, একটু খাবেন?'

ভুলেই গেচি পৃথিবীতে কোথাও আছে স্নেহের বন্ধন, কোথাও আছে অযাচিত আত্মীয়তা, ভুলেই গেচি কোথাও আছে মানুষের জন্য মানুষের উদ্বেগ ও হিতকামনা। মনে হ'লো ইনি এসেচেন দূর

বাংলার শ্যামশ্রীর কমনীয়তা নিয়ে, মৃত্তিকার মমতা নিয়ে। তবু বিনীত-কণ্ঠে বললাম, 'শাস্ত্রে বলে, তীর্থের পথে প্রতিগ্রহ করা উচিত নয়।'

'ও, তবে থাক্, সে কথা আমার মনে ছিল না!' বলতে বলতে তিনি নতমস্তকে চলে গেলেন।

আজ শ্রীনগরে পৌঁছনো চাই। তাড়াতাড়ি বেলা আড়াইটে আন্দাজ সবাই পথে নেমে এলাম। পায়ের জন্য সোজা হয়ে চলতে পারচিনে, বউটিও নিতান্ত লাঠি ধরে ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটচেন, ভালো মালিশের ব্যবস্থা না করলেই আর চলচে না। মাত্র দিন-ছয়েক আমরা হাঁটচি, এখনো অন্তত একমাস পথ হাঁটতে হবে, পা-গুলিকে সুস্থ রাখা চাই-ই। এক জায়গায় দু'চারদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা পায়ের ব্যথা সারিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমাদের চলার ছন্দ ভেঙে যায়, পিছিয়ে পড়তে হয়, সময়ের সঙ্গে তাল রাখা যায় না। পথের যারা সুখ-দুঃখের অস্থায়ী সঙ্গী—সকালে-বিকালে দুঃখে দুর্গমে যাদের ব্যথিত ও করুণ মুখগুলি আমরা নিয়মিত দেখে দেখে যাই, তাদের একেবারে হারাতে হবে। আমরা সবাই সবাইয়ের পরমাত্মীয় হয়ে উঠেচি—পণ্ডিতজী, পাগড়িপরা রামায়ার, একটি পুণা-আগতা মারহাট্টি বৃদ্ধা, গোপালদা, অম্‌রা সিং, কুলী কালীচরণ ও তুলসীরাম, ব্রহ্মচারী, রুইদাস সুক্কুল—এদের কাউকে ছাড়তে গেলে বুকে বড় বাজবে। জাতি-বিচার নেই, স্পৃশ্যতা ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন নেই, সকলে

একত্রে বৈঠকে বসে তামাক খাওয়া চলে। হোক্ কালীচরণ কুলী, সে কল্‌কে টেনে গোপালদার হাতে দেয়, গোপালদা দেন অম্‌রা সিংকে, অম্‌রা সিং দেয় ব্রহ্মচারীর হাতে, ব্রহ্মচারীর প্রসাদ পায় রুইদাস সুক্কুল। সন্ধ্যাবেলা মৌজে না থাকলে কারো চলে না, বাইরের পৃথিবীর কোনো সংবাদ নেই তাদের কাছে, মানুষের কল্পকামনায় ঘেরা যেন কোন্ এক অলোকসামান্য রূপকথার স্বপ্নরাজ্য, তাদের মাথার উপর আসে প্রথম সূর্যরশ্মিলেখা, তারা জানে উদাসিনী সন্ধ্যার রহস্যময় পথ। তারা সবাই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, তাদের মুখে শুধু তীর্থ ও দেবমন্দিরের গল্প ; নদী, সাগর ও তুষার-দেশের গল্প ; বন্যজন্তুর গল্প ; বিপদের কথা ও কাহিনী।

এবেলা প্রায় আট মাইল পথ। ভারি পায়ে লাগচে হাঁট্‌তে। ভীলকেদার পর্যন্ত চার মাইল পথটা অতিরিক্ত কষ্টদায়ক। এখানকার আর-এক নাম ঢুণ্ডপ্রয়াগ। ভীলগঙ্গা ও অলকানন্দা এখানে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধা হয়েচেন। খান পাঁচ-ছয় জীর্ণ চটি রয়েচে পাশাপাশি। প্রথমে প্রস্তাব হ'লো, আজকের মতো ভীলকেদারেই আস্তানা নেওয়া যাক্, কিন্তু কারো মনঃপূত হ'লো না। বেলাও অনেকটা এখনো বাকি, অনায়াসেই এখনো তিন-চার মাইল হাঁটা চলে। পায়ের ব্যথার নাম করে আমরা দু'একজন আপত্তি তুললাম, কিন্তু জনমতেরই জয় হ'লো। শোনা গেল, পথে চড়াই আর উৎরাই তেমন কিছু নেই, বেশ পা ছড়িয়ে হাঁটা

চল্‌বে, শ্রীনগরে আজই পৌঁছনো উচিত।

মল্লিকা আর মালতী-লতায় এবেলার পথ ছাওয়া। বুনো গোলাপের জঙ্গল থেকে মুখচোরা গন্ধ ভেসে আসচে। এতদিন পরে আজ একটু সমতল পথ পেলাম। অলকানন্দার তীর থেকে ঢালু পাহাড়ের গা পর্যন্ত চাষ-আবাদ চল্‌চে। নদীর কোলে কোলে ক্ষুদ্র এক একখানি গ্রাম চিত্রপটের মতো আঁকা। পথে কাঁচা সিদ্ধি ও ফণীমনসার গভীর জঙ্গল, তার ভিতর দিয়ে যাত্রীরা চলেচে। এ অঞ্চলে সকলের চেয়ে বিস্ময়কর হচ্চে আম ও সজিনা গাছ। আশপাশে কোথাও চূন ও বালির পাহাড়, শুক্‌নো ঝরনার গভীর দাগ। নদীর ওপারে মনোরম প্রাকৃতিক শোভা, পর্বত-প্রাচীরে আমাদের ক্লান্ত দৃষ্টি আর প্রতিহত হচ্চে না, চোখ-গুলি প্রকৃতির অখণ্ড অবকাশের মধ্যে ছাড়া পেয়েচে। স্নায়ুর গ্রন্থিগুলি আল্‌গা হয়ে এই কমনীয়তার মধ্যে এলিয়ে পড়তে চাইচে। প্রায় আমরা নদীর সমতলে এসেচি।

পিছনেই পড়েছিলাম। চল্‌তে চল্‌তে দেখি, মা আর মেয়ে পথের ধারে কাৎ হয়ে বসে পড়েচেন। এগিয়েই যাই আর পিছনেই পড়ি, সকলেরই সাক্ষাৎ একবার করে পাওয়া যায়, চল্‌তে চল্‌তে দু'একবার সকলকে বিশ্রাম নিতেই হয়—জল খায়, গায়ে হাওয়া লাগায়, আবার আড়ষ্ট শরীর সোজা করে চল্‌তে থাকে। নদীর কাছে নামলে গ্রীষ্মকাল, চড়াই পথে উঠলে শীতল আবহাওয়া। গরমের চেয়ে ঠাণ্ডাতেই যাত্রীদের সুবিধা। শাশুড়ী



মধ্যপথে

ডেকে বললেন, ‘তোমাদের শ্রীনগর আর কতদূর বাবা ? মেয়ে যে আর চলতে পারে না।’

দাঁড়িয়ে কথা কইতে গেলে সর্বশরীর কন্‌কন্ করে, ঝুলি-কম্বল নামিয়ে পথের এপারে মুখ বিকৃত করে বসে পড়লাম। বললাম, ‘আর বেশি দূর নেই।’

বিশ্রামান্তে আবার সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হ’লো। ঝোলা-ঝুলির মৃত্যুযন্ত্রণাদায়ক বোঝা আবার পিঠে তুলে নিলাম। মা ও মেয়ে লাঠি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে এগিয়ে চললেন। একবার বললেন, ‘অঘোরকে বলি বাবা, এতখানি পথ ত আমরা হাঁট্‌তে পারবো না, না-হয় দশদিন দেরিই হবে, প্রাণ যে যায়! দশ মাইলের বেশি মেয়েমানুষের পক্ষে রোজ হাঁটা···সে হবে না বাবা।’

পথের উপর জুতো ঘষতে ঘষতে তাঁরা চলেছিলেন। বাস্তবিক, তাঁদের অবস্থা দেখে যে কোনো লোকেরই মনে হবে, এখনি হয়ত কোথাও তাঁরা অকর্মণ্য হয়ে পথের ধারে শুয়ে পড়বেন—কিছুই বিচিত্র নয়!

অবশেষে এক সময় শ্রীনগরের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হ’লো। পথের ধারেই কালীকম্বলীওয়ালার একটি জলসত্র, বাঁ দিকে ফণীমনসার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের দিকে চলে গেচে। পথের মোড়ে অঘোরবাবু ও ব্রহ্মচারী প্রতীক্ষা করছিলেন। মা ও মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, ‘এমন করে আমরা কিন্তু হাঁট্‌তে

পারিনে, সকলের শরীর ত আর সমান নয়! পায়ের এই শোচনীয় অবস্থা—'

ব্রহ্মচারী বললে, 'ধর্মশালায় গিয়ে আপনার পায়ের জন্য আমি ভালো ওষুধ করে দেবো মা।'

'আচ্ছা বাবা।' বলে বউটি মায়ের সঙ্গে অগ্রসর হ'তেই অঘোরবাবু বললেন, 'কমলেশ্বর দর্শন করা হবে না ?'

'মাথায় থাকুন!'—একটু বিরক্ত হয়েই তাঁরা কথার জবাব দিয়ে গেলেন।

সকলে একে একে এগিয়ে যাবার পর আমি ও ব্রহ্মচারী গেলাম মন্দির দর্শনে। কিন্তু এমন কিছুই নয়। পুরাতন শুষ্ক মন্দির, ভিতরে প্রকাণ্ড এক শিবলিঙ্গ। পূজা-অর্চনার কোথাও আয়োজন নেই। নিকটে বোধ হয় কোথাও গ্রাম ছিল, ছেলেমেয়েরা ও মন্দিরের রক্ষকের দল ছুটে এসে পাই-পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। ভারতের প্রায় সকল তীর্থেই ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের 'পরে এমনি জুলুমই চলে। চাতুরী ও ফন্দির দ্বারা যাত্রীদের শোষণ করা এদেশের বহু তীর্থগুরুদের একটি প্রধান কাজ। উত্ত্যক্ত হয়ে ফিরে এলাম। পথ আর বেশিদূর ছিল না, খানিকটা রাস্তা এসেই ডানহাতি একটা পাকা গাঁথুনির বড় হাসপাতাল পাওয়া গেল। খুশী হয়ে ভিতরে ঢুকলাম। যে ক'জন রোগী রয়েচে তারা সবাই অকর্মণ্য যাত্রী।

খুঁজে খুঁজে এসে ধর্মশালার ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে

ড় মহলা প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। সুমুখে একটি মন্দিরে সন্ধ্যারতির আয়োজন চলচে। বিরাট দোতলা ব্যারাক। ভারি স্ফূর্তি হ'লো। লাঠিটা অবলম্বন করে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে নিলাম। রাস্তার উপরেই দুটো বড় বড় খাবারের দোকান, অতএব আমার রান্নাবান্না করতে হবে না, নৈশভোজন পর্বটা সমারোহের সঙ্গেই আজ সাঙ্গ হবে! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দোকানে চায়ের বন্দোবস্তও হতে পারে! তবে আর কি, কেল্লা মার দিয়া, আর পায়ে ব্যথা নেই,—বদরীবিশাললাল কি জয়! ওঁ নমো নারায়ণায় !—আনন্দে ব্রহ্মচারী লাটুর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কী অনির্বচনীয় আরামদায়ক রাত্রিই না নেমে এলো। দুগ্ধ, দধি, জিলিপি, চা, উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ব পুরি, আলুর তরকারি, অম্ল—সবগুলিই প্রায় একত্রে ভোজন করা গেল। আহারের পর্বটি যতক্ষণ চললো, ব্রহ্মচারী চোখ খুল্‌লো না। বললে, 'দাদা, মুখব্যাদান করে থাকি, যত খুশি লগেজ ভেতরে ঢুকিয়ে দিন্।'

'কলেরা হবে যে ব্রহ্মচারী!'

উচ্চকণ্ঠে এই ক্ষুদ্র মানুষটি চক্ষু বুজেই হেসে উঠলো। বললে 'দাদা, ভয় পাচ্ছেন রথে উঠে? বিশ্বরূপ দেখিয়ে দেবো? এই পেটে আজ সব গ্রাস করে ফেল্‌তে পারি! আমি দাদা উপোসী ছারপোকা!'

আহারান্তে ব্রহ্মচারী গান গাইতে গাইতে উপরে উঠে এলো।

পাশাপাশি দু'জনে কম্বল ছড়িয়ে জমি নিলাম। আজ ব্রহ্মচারী ঘন ঘন 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ছাড়তে শুরু করেচে। মনে হ'লো আজ-কের আহারে তার দন্ত, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও তালু—সবগুলি পরিতৃপ্ত হয়েচে। কত গল্পই সে করলো। ওধারে গোপালদা সদলবলে এসে বুড়ীদের গোলকধাঁধাঁয় ঘুরপাক খাচ্চেন। সন্ধ্যায় একমাত্রা আফিম ও এক ছিলিম্ ধূমপানের পর গোপালদা এক অভিনব মূর্তি ধারণ করেন,—দেবলোকের পারিজাত-কাননে দার্শনিকের মতো তিনি ভ্রমণ করে বেড়ান্, সে সময়ে কেউ উত্ত্যক্ত করলে তাকে হত্যা করা উচিত। বিড়ালস্বভাব বুড়ীগুলোর জ্বালায় বেচারার আর শান্তি নেই! মাথার দিকের ছোট্ট ঘরটিতে অঘোর-বাবু সপরিবারে এসে উঠেচেন, এইমাত্র তাঁদের আহারাদি শেষ হয়েচে। তাঁরা এসে একবার আমাদের ভোজন ও শয়ন সম্বন্ধে তদ্বির করে গেলেন।

পায়ের বেদনা কিন্তু কারোরই কমলো না, নানা টোট্‌কা, মুষ্টিযোগ, হাসপাতালের মালিশ,—কিছুতেই না। অতএব সাব্যস্ত হ'লো অল্প অল্প পাঁচ-সাত মাইল রোজ হাঁটতে হবে। কষ্টের সময় আমরা সাধারণত যে কল্পনা করি, কার্যক্ষেত্রে তার ঘটে পরিবর্তন। পথে নেমে মনে হয়, পথ ফুরোলেই বাঁচি। শ্রীনগর থেকে প্রাতে বেরিয়ে বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় আমরা ভট্টিসেরায় এসে পৌঁছলাম। পথে সুকৃতা নামক ক্ষুদ্র নদী ও একটি চটি পার হয়ে এলাম। ভট্টিসেরার পথ একটু সমতল, তাই আট মাইল এক

বেলায় পার হয়ে আসতে পারলাম। পাশেই নদী, নাম হর্ষবতী, অলকানন্দারই একটি শাখা। চটির পাশে একটা ঝরনা, তারই প্রবাহকে বুদ্ধির দ্বারা মানুষ কেমন আপন প্রয়োজনে লাগিয়েচে সেই দৃশ্যই এখানে দেখা গেল। এর নাম পানচাক্কী, অর্থাৎ পানি ও চাকা। কাঠের একখানা চাকার উপরে জলস্রোত এসে ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দিচ্চে, উপরে লাগানো আছে পাথরের জাঁতা এবং তার মধ্যে গম। বিনা পরিশ্রমে আটা তৈরী হচ্চে। তারিফ না করে উপায় নেই। যতদূর স্মরণ আছে, ভট্টিসেরায় গোপালদার দলের বামুন-মার সঙ্গে অঘোরবাবুর কলহ হয়। উপলক্ষ—জাতি-বিচার ও শুচিবাতিক। অত্যন্ত সামান্য কারণে বামুন-মার প্রচণ্ডতা দেখে অঘোরবাবুর স্ত্রী স্তম্ভিত হাসি হেসে মুখের দিকে তাকালেন। বামুন-মা আমাদের সনাতন ধর্মের মূর্তিমতী প্রতিমা, জাতিবিচার ও অস্পৃশ্যতা ছাড়া তিনি বাঁচবেন কেমন করে? তিনি সান্‌কি-ভাঙার মতো খান্ খান্ করে' উঠলেন, 'কি পাপেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েচে মা, শুক্‌নো কাপড়খানি আমার কোন্ আক্কেলে ছুঁয়ে দিলে? শূদ্দুরের বাড়াবাড়ি আজকাল বড্ড বেড়ে গেচে বাছা!'

অঘোরবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল, স্ত্রী এসে তাঁকে সাম্‌লে বললেন, 'ছি, যতই হোক্ ব্রাহ্মণের মেয়ে, ওঁর সম্মান রেখে চল্‌তে হয়।'

ব্রহ্মচারী রাগে গোঁ গোঁ করে বললে, 'ও কি বামুনের মেয়ে

মা, ও ত চণ্ডাল।'

'ছি বাবা, ও কথা বল্‌তে নেই। যে অন্ধ তার দৃষ্টি নেই বলে গাল দেওয়া বড় পাপ।'

গোপালদা নীরবে বসে রইলেন, বোবার শত্রু নেই! কিন্তু সেইদিন বিকাল বেলায় আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলাম। ছান্তি-খালের উত্তুঙ্গ এবং মর্মান্তিক দু'মাইল চড়াই অতিক্রম করে খাঙ্করা চটির দিকে নেমে এলাম—তখনো সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। অপেক্ষাকৃত সমতল স্থান; নিকটে অলকানন্দারই আর একটি শাখানদী, নাম পট্টবতা, অদূরে মনোরম একটি পার্বত্য উপত্যকা, তিনদিকে গগনস্পর্শী পার্বতচূড়া, স্নিগ্ধমধুর বাতাস, ঝরনার ঝঙ্কার, বনফুলের লজ্জাজড়িত গন্ধ,—অঘোরবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আজকে আর এগিয়ে কাজ নেই, এখানেই থাকুন না?'

পথের দিকে একবার ফিরে তাকালাম। প্রায় এক মাইল দূরে নদীর বাঁকে সদলবলে গোপালদার সুস্পষ্ট ক্ষুদ্র শরীরটি দেখা গেল, মন্থরপদে পিপীলিকাশ্রেণীর মতো তাঁরা চলেচেন, অন্যান্য সঙ্গীরাও যাচ্চেন। বললাম, 'ওদের কি ছেড়ে দিতে বলেন?'

তাঁর হয়ে অঘোরবাবু বললেন, 'মাইল দুই হয়ত পিছনে থাকবো, তারপর ধরে নিলেই চল্‌বে।' শাশুড়ী বললেন, 'তাই থাকো বাবা, তোমার শরীর আমাদের চেয়েও খারাপ হয়েচে, আমাদের কুলীর কাছে বিছানা আছে, তারা আসুক, তোমার জন্যে বিছানা পেতে দিই। এবেলা তোমার আর আলাদা রেঁধে

কাজ নেই, আমাদের সঙ্গেই ব্যবস্থা হোক।' ব্রহ্মচারী বললে, 'আজকের মতো ওদের মায়া-মমতা কাটান দাদা।'

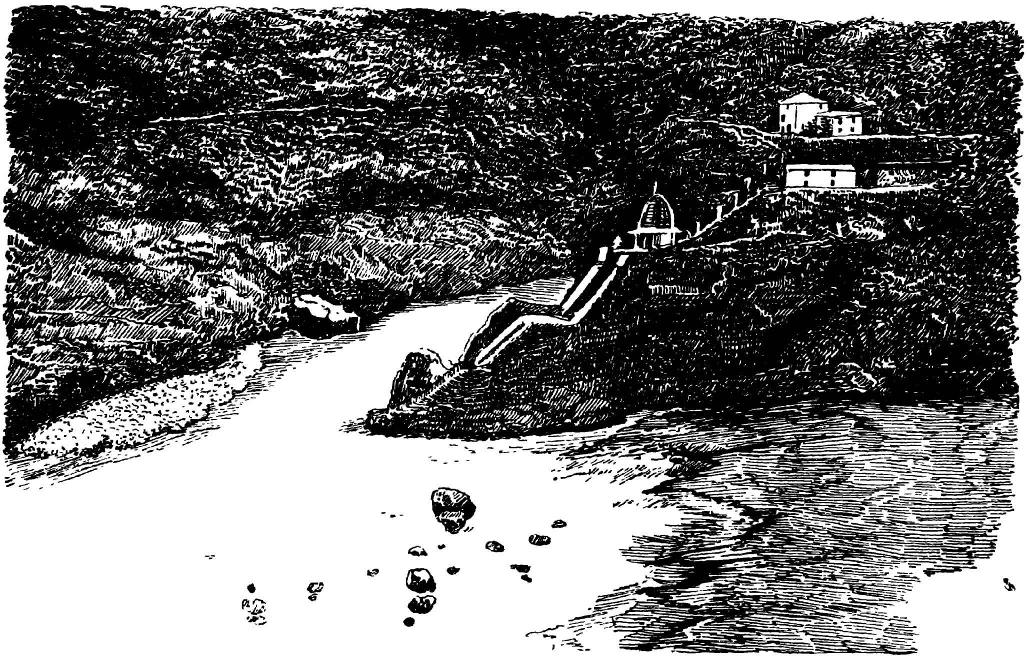
স্বামী-স্ত্রী তখন এদিকে তাকিয়ে জয়ের হাসি হাসচেন। আমাকে যেন তাঁরা জয় করেচেন। বললাম, 'আজ না-হয় রইলাম এখানে, কিন্তু এত অল্প পথ হাঁট্‌লে অন্য দিন আমার ত চল্‌বে না! যাত্রাটা আমার তাড়াতাড়ি শেষ করা চাই।'

'বেশ ত, আজকের মতনই না হয় থাকুন, মায়ের অনুরোধও ত রাখতে হয়!'

সন্ধ্যা হ'লো, পাহাড়ের চূড়ার পাশে শীর্ণ চন্দ্র দেখা দিল, তারায় তারায় ছেয়ে গেল আকাশ—সমস্তটার চেহারাই যেন কেমন করে বদ্‌লে গেল। হয়ত এমনি করেই বদ্‌লায়। দিনে প্রখর আলো, স্থূল বাস্তবিকতা, মানুষের দৈন্য ও স্বার্থের অতি স্থূল ঘাত-প্রতিঘাত; কিন্তু কি আশ্চর্য, রাত্রে সব বদ্‌লায়, এই বিশ্ব-প্রকৃতিকে প্রসাধন-পারিপাট্যে অলঙ্কৃত ক'রে কে যেন মনোহর করে তোলে, রাত্রির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় দিনের প্রখরতা যেন আর মনে পড়ে না।

ওঁদের আন্তরিক যত্ন ও পরিচর্যায় সে-রাত্রে আমরা সবাই যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। উচ্চশিক্ষার এমন একটি দীপ্তি ও গাম্ভীর্য বৌটির মুখে চোখে দেখলাম যে, আমরা দু'জন সন্ন্যাসী পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। ব্রহ্মচারী ত 'মা' 'মা' বলে একরূপ উন্মত্ত হয়ে উঠলো। আমি বাইরে বসে আকাশের তারা

শুন্‌তে শুরু করে দিলাম। সে-রাত্রি কাটলো। সকাল বেলা ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আগেই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম তিন-চার মাইল পথ আমরা নিঃশব্দে হন্‌হন্‌ করে চলে যাই। পথে কোথাও সকালের দিকে প্রায়ই দুধ মেলে, চার আনা ছ' আনা সের। গরম দুধ খেয়ে আবার চলি। আজকে সঙ্গে আর যাত্রী নেই, যে দু' একজন পাওয়া গেল তারা অপরিচিত, সহযাত্রী দেখে 'জয় বদরীবিশাল' বলে চল্‌তে লাগলো। চল্‌তে চল্‌তে আমরা চিড়বনের বায়ুপ্রবাহের মতো পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পাই— বিশেষ করে চড়াই পথে ওঠবার সময়। আজকের পথ কোথাও অতি সঙ্কীর্ণ, যথেষ্ট সতর্ক হয়ে সাবধানে হাঁটতে হচ্চে, নীচের দিকে অতি সাহসী ব্যক্তিরও তাকাবার দুঃসাহস নেই, মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, অতল পাথার যেন যাত্রীদের নিরন্তর আকর্ষণ করে নেবার চেষ্টা করচে। পায়ের ব্যথাটা সহ্য করে চলা অভ্যাস হয়ে গেচে, যন্ত্রণা ও দুঃখ শরীরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েচে, সোজা হয়ে সুস্থ দেহে হাঁটতে ভুলে গেচি। সমস্ত দুঃখই মানুষকে এমনি করে সহনশীলতা দেয়, আপন প্রয়োজন সিদ্ধ করতে মানুষকে সে উপযুক্ত করে, খাঁটি করে নেয়, দুর্গমকে সহজ করে দেবার জন্য তাকে সে কঠিন করে তোলে। নির্মল ও পরিচ্ছন্ন হয়ে আমাদের চলার উপায় নেই, সমস্ত পথটির দাগ আমাদের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেচে। লোকের চোখে আমরা আগেকার সেই সামাজিক মানুষ আর নেই, আমাদের সর্বশরীরে হিমালয়ের



রুদ্রপ্রয়াগ

তাপ, একদিকে জ্বালা-যন্ত্রণা অন্যদিকে দুঃসহ ক্লান্তি, ছিন্ন-মলিন বসন, ধূলি-ধূসর কালিবর্ণ দেহ, কোটর-প্রবিষ্ট ক্ষীণ ও শূন্য দৃষ্টি, রক্তহীন শীর্ণ রূপ—আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলি। আমরা যেন খরচ হয়ে গেচি, দেউলে হয়ে গেচি।

সেদিন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা কয়েকজন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় অলকানন্দার পুল পার হয়ে রুদ্রপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। বিশ্রাম, কোথাও একটু বিশ্রাম নিতে চাই।

কিন্তু হায় রে, নির্লজ্জ দেহ আবার স্নিগ্ধ মধুর বাতাসের স্পর্শে একটু একটু করে সজীব ও সচল হয়ে ওঠে। ধর্মশালার নীচেই যে ঘন নীল অলকানন্দার কলকল্লোল, কেমন করে চোখ বুজে পড়ে থাকি! বনরাজিশ্যাম পর্বত-চূড়ার ছায়া নেমে এসেচে যে জলধারার উপরে—ওরে মন, চেয়ে দেখ্। চেয়ে দেখি,—দেহ আর কাতর নয়, দৃষ্টি আর ক্ষীণ নয়, ব্যথা নেই, বিক্ষোভ নেই,—এমনটি আর কোথায় কবে দেখেচি! এ ত কেবল রূপ নয়, এ যে রূপাতীত; এ যে সকলের চেয়ে বড় শিল্পী, সর্বোত্তম স্রষ্টার কারুকার্য। ওরে মন, চেয়ে দেখ্!

ধীরে ধীরে উঠে বসলাম, যেন হাড়গোড় ভেঙে পঙ্গু হয়ে গেচি, পায়ে আর হাত দিতে পারচিনে, যেন বড় বড় ফোড়া উঠেচে। এই রুদ্রপ্রয়াগ! সামান্য একটুখানি শহর, ও-পারে পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট দুটি সরকারি বাঙলো, দক্ষিণে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম তীর্থ। একটি নদী দেবলোকের,

অপরটি ব্রহ্মলোকের। এই নদীর সঙ্গমে একদিন গয়রাজার যজ্ঞে অসন্তুষ্ট পরশুরামের শাপে ব্রহ্মরাক্ষস-জন্মপ্রাপ্ত দু'লক্ষ ব্রাহ্মণ মুক্তিলাভ করেছিলেন। এখানে আছে রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির, ধর্ম-শালা, সদাব্রত, ডাকঘর ও একটি ক্ষুদ্র বাজার। রুদ্রপ্রয়াগে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেচে। একটি পথ কর্ণপ্রয়াগ হয়ে অলকানন্দার তীরে-তীরে সোজা চলে গেচে বদরিকাশ্রমের দিকে, আর একটি পথ মন্দাকিনীর তীরে-তীরে কেদারনাথের দিকে উঠে গেচে। আমরা প্রায় একশো মাইল অতিক্রম করে এসেচি। ভিতরে চারিদিকে চেয়ে দেখি, যেন মৃত্যুপুরী। জ্বরাক্রান্ত, আমাশয়গ্রস্ত, অকর্মণ্য কোনো কোনো যাত্রী, মুখে চোখে মাছি বসেচে, কিন্তু সাড়া নেই ; মৃত্যু ঘট্‌লে শববহনের লোক নেই! অথচ এমনি করেই এরা চলেচে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, টিকটিকির মতো পাহাড় বেয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে রোগে ও যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে অনেককেই থাম্‌তে হয়। সহযাত্রীরা একবার মুখ ফিরিয়ে উদাসীন হয়ে 'আহা' বলে চলে যায়! বাবার বুঝি দয়া হ'লো না!

দিন গড়ালো অপরাহ্নের দিকে! যারা কেদারনাথের দিকে উজিয়ে যেতে ভয় পেল, তারা যাত্রা করলো সোজা বদরীনাথের দিকে। কেদারনাথের পথ ভয়াবহ। কেদার দর্শন করতে গেলে আরো প্রায় আশী মাইল পথ হাঁট্‌তে হয়। রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গমে তাই যাত্রীদের হয় পুণ্যকামনার অগ্নিপরীক্ষা। যারা দেহের ভয়ে

ভীত, অশক্ত ও দুর্বল, যাত্রার উৎসাহ যারা হারিয়েচে, রোগ-মসী-ঢালা কালী তনু যাদের, তারা আর কেদারের পথের দিকে ফিরেও তাকায় না, সোজা চলে যায় কর্ণপ্রয়াগের দিকে। তাদের পক্ষে শুধু বদরী, কেদার-বদরী নয়! আমিও কেদার পরিত্যাগ করবার সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু ঘটনার প্রতিঘাত হ'লো অন্য রকম। অপরাহ্নের দিকে একজন নিম্নশ্রেণীর বাঙালী স্ত্রীলোক হঠাৎ খুঁজে খুঁজে পায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়লো,—'ও বাবা, রক্ষে করো বাবা, আমার মা-গোঁসায়ের আর কোন উপায় নেই, তোমার কথা সারা পথ শুনতে শুনতে এসেচি বাবা,··· আমাদের আর কেউ নেই ধন!'

প্রথমটা সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো, কান্না থামলে যে ঘটনাটা সে ভেঙে-ভেঙে জানালো তা হচ্চে, গুরুমা ও জন-কয়েক শিষ্যা এসেছিল কলকাতার উল্টোডিঙি বোষ্টমের আখ্ড়া থেকে, শেঠের বাগানে তাদের আখ্ড়া। বেশ আসছিল সবাই, পরশু রাতে কোন্ এক চটিতে অন্ধকারে গুরুমা চটির দরজা থেকে কি-একটা প্রয়োজনে নেমে এসেছিল, হঠাৎ পা ফস্কে পাহাড় থেকে পড়ে যায়, ওলোট-পালট খেয়ে গড়িয়ে কোথায় যেন আট্কায়, চটির লোক নেমে গিয়ে তুলে আনে। তারা দেখে, গুরুমার সর্বশরীরের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ, রক্তাক্ত ও অচেতন। পয়সা-কড়ি যা ছিল তাই দিয়ে অতিকষ্টে এক কাণ্ডি যোগাড় করে বুড়ীকে শ্রীনগরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে

প্রাথমিক চিকিৎসা হয় বটে কিন্তু স্থানাভাবে রোগীকে কর্তারা রাখতে চায়নি, ঔষধপত্র কিছু সঙ্গে দিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে দিয়েচে পাঠিয়ে। '—এসো বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একটা ব্যবস্থা করে দাও।' হাউ-হাউ করে সে আবার কান্না জুড়লো।

ঘটনাটা অবশ্য সবই সত্য। নীচে এসে দেখি, বুড়ী যন্ত্রণায় মর্মান্তিক চীৎকার করচে। সমস্ত জীবন ধরে ধর্মাচরণ করে ও শিষ্যার কানে মন্ত্র দিয়ে এই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থের পথে এসে একটি নারীর এমনি শোচনীয় পরিণাম! কিন্তু জীবনে এমনিই ত হয়। অপরাধ নেই অথচ শাস্তি আছে, পাপ নেই অথচ আছে একটা যুক্তিহীন প্রতিফল, কারণ নেই অথচ রয়েচে দুঃখ ও ব্যথার একটানা দুর্ভোগ। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই, সময় বয়ে যায়, অতএব লাঠির উপরে অবলম্বন করে লোকজন ডেকে এনে বুড়ীর অবস্থার কথা নিবেদন করলাম। একটি স্থানীয় যুবক ও অঘোরবাবু সেদিন যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু এত করেও পনেরো টাকার প্রয়োজনে সাড়ে বারোটি টাকার বেশি চাঁদা ওঠানো গেল না। বাকিটা নিজেদেরই ভাগা-ভাগি করে দিতে হ'লো।

টাকাগুলি একটি শিষ্যার হাতে গুনে দিয়ে বুড়ীকে আগামী কাল প্রাতে উখীমঠ হাসপাতালে ডাণ্ডিযোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে এলাম তখন নিশ্চয় রাত দশটা বাজে। প্রায় সব যাত্রীই তখন গভীর ঘুমে অচেতন

এতক্ষণে ব্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া গেল। ঝড়-ঝাপ্টার সময় কোথায় যে সে অদৃশ্য হয় বোঝা যায় না। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে বললে, 'দাদা, গান শুনবেন?'

গান! এই মৃত্যু দিয়ে ঘেরা মহা দুর্গমে কেউ আবার গান গায়? পীড়িতের নিশ্বাস শুনেচি, জর্জরিতের বিলাপ শুনেচি, গান ত শুনিনি! বিস্মিত হয়ে বললাম, 'গান কোথায় ব্রহ্মচারী?'

'আসুন আমার সঙ্গে।' বলে সে হাত ধরে নিয়ে চললো।

পথ নিস্তব্ধ। কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে এসেচে, শরীর বড় ক্লান্ত, তবু যেতে হ'লো। পথ ঘুরে সোজা সে নদীর সঙ্গমের ধারে এসে বললে, 'নেমে আসুন, এই যে বাঁধানো সিঁড়ি!'

'কোথায় যাবো, এ যে নদী! নদীর গান নাকি?'

'নামুন না সিঁড়ি দিয়ে, বলি।'

লাঠির উপরে শরীরের ভর দিয়ে পায়ের ব্যথা নিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নামলাম। এতক্ষণ পরে দেখলাম, সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। পরিচ্ছন্ন সুস্মিত নীল আকাশে নক্ষত্রগুলি জ্বল্ জ্বল্ করচে। দুইটি নদীর ঘাত-প্রতিঘাতে জলের প্রবল গর্জন, কান পাতা যায় না। তবু সে শব্দ অতিক্রম করেও মনে হ'লো, আজ বড় সুন্দর প্রশান্ত রাত্রি। আজ আর ঘুমোবার কথা নয়, নদী-পর্বত ও জ্যোৎস্নার দিকে একান্তমনে তাকিয়ে আজকের রাত

এমনি করেই কাটানো উচিত। সেই স্বপ্নময় রাত্রে নদীর গর্ভের দিকে ইঙ্গিত করে ব্রহ্মচারী বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে, এই যে বাঁ-হাতি—'

সিঁড়ির পাশেই পাহাড়ের ঢালু গায়ে একখানি কাঁচাপাকা কুটীর। ব্রহ্মচারীর পিছনে পিছনে তার ভিতরে এসে ঢুকলাম। টিপ্‌টিপ্‌ করে এক কোণে একটি আলো জ্বল্‌চে। ব্যাঘ্র ও ভল্লুক-চর্মের খান-তিনেক আসন পাতা, তারই একটির উপরে এক স্থূলকায়া বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী বসে রয়েচেন, নবাগতকে দেখে হেসে সস্নেহে ডাকলেন, 'আও বেটা!'

তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে বসে প্রণাম করলাম। বুঝলাম আসবার আগেই ব্রহ্মচারী আমার সম্বন্ধে এঁর কাছে আলোচনা করে রেখেচে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, একপাশে একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ হাতে একটি একতারা নিয়ে বসে রয়েচেন, সম্ভবত তিনিই গায়ক। আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'লো না, অনেক তীর্থ সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগলো। সন্ন্যাসিনী নারায়ণ গিরি মায়ি কৈলাস যাবার জন্য পরামর্শ দিলেন, আষাঢ় মাসেই কৈলাস যাবার উপযুক্ত সময়, এবারের সুযোগ যেন ত্যাগ না করি। বিনয় ও ভক্তি সহকারে তাঁর বাণী শুনে যাচ্ছিলাম। ঘরের ভিতর আসবাবপত্র বলতে কয়েক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, গোটা দুই শাঁখ, কাঠের কয়েকটা কৌটা, খান চারেক কম্বল, পাথরের কয়েকটা বাসন, কতকগুলি তাম্রপাত্র ও ফুল, মোটা মোটা খান

অনেক বই, আগুন রাখার একটা খাপরা। অনেক গল্পই মায়িজির সঙ্গে চল্‌তে লাগলো, সবাই যোগ দিলাম, মায়ের কাছে সবাই বেটা ও বেটি,—বড় ভালো লাগলো। আলোটা টিপ্‌টিপ্‌ করচে, দরজার কাছে আকাশ থেকে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েচে, মায়িজি তাঁর মনোরম হিন্দি ও উর্দু ভাষার লালিত্য দিয়ে তাঁর বহু তীর্থপথের অভিজ্ঞতার কথা বলে যেতে লাগলেন। কোথায় কোন্ নদীর তীরে হিংস্র শ্বাপদের আনাগোনা, কোন্ মরুভূমি পার হয়ে কোথায় গেচে অপরিচিত দুর্লভের পথ, অজানা কোন্ পর্বত-চূড়ার তুষারাচ্ছন্ন পথে কবে ঝব্বু ও ঘোড়ার পিঠে উঠে তাঁকে কৈলাস যেতে হয়েছিল, তারই রহস্যময় ও চমকপ্রদ কাহিনী। কথা বলতে বলতে এক সময় তিনি ভিতরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছিলম্ বনায় দেও রগ্‌গি, এ সোনি ?'

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, 'দেথৈ মায়ি !' এবং তারই মিনিট দুই পরে দু'টি তরুণী সন্ন্যাসিনী লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন। প্রথমটি মায়ের কাছে এসে বসলেন এবং দ্বিতীয়টি একটি পিতল-বাঁধানো বড় সরু কল্‌কে মায়িজির হাতে দিয়ে অন্য পাশে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই মনে হ'লো এ দুটি ফুল একই বৃন্তের। মাথায় জটাময় রুক্ষ আলম্বিত বেণী, মুখে সংযমের একটি মিশ্র দীপ্তি ও কাঠিন্য, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার দেহ, গৈরিক বসন, চারিটি চক্ষে নির্বিকার ও নিস্পৃহ শূন্য দৃষ্টি। ব্রহ্মচারী দেশালাইটা জ্বালালো, মায়িজি কল্‌কেয় টান দিলেন। যখন

ধোঁয়া ছাড়লেন কুটীরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল. সকলের হাতে হাতে কল্‌কেটা একবার করে ঘুরে এলো। তাঁদের অকুণ্ঠ ধূমপান দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম।

এবারে বৃদ্ধের গান গাইবার পালা। একতারাটি বাগিয়ে তিনি ধীরে ধীরে কণ্ঠের আওয়াজ তুললেন। গান তিনি চমৎকার গাইলেন। মুগ্ধ শ্রোতার দল নিঃশব্দে কান পেতে বসে রইল, কেবল ছিলিম্‌টা মাঝে মাঝে এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুড়ে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু সমস্তটার মধ্যে একটি বিস্ময় নিহিত ছিল। এ যেন একটি অবাস্তব রূপকথা। আমরা নবাগত বিদেশী, বৃদ্ধ গায়কটিও সম্ভবত নতুন পরিচিত, সম্মুখে এই মমতাময়ী আশ্রয়দাত্রী, তাঁর দুই দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী,—এই তিনটি নারীর ঘর-দুয়ার, জীবন-যাত্রা, আচার-ব্যবহার, কোথা থেকে এঁদের আগমন, এঁরা কে এবং কী এঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য, এমনিতর নানা চিন্তা-সমস্যায় আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। অথচ আজ তাঁদের কথা লিখতে বসে একান্ত আন্তরিকতায় স্বীকার করে যাবো যে, সেই জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দর রজনীতে, সেই রহস্যময় ক্ষুদ্র কুটীরের স্বল্পালোকিত পরিবেষ্টনীর মধ্যে সন্ন্যাস-জীবনের একটি অপূর্ব সংযম ও শ্রী সকলের মুখগুলিকে নির্মল ও উদাসীন করে রেখেছিল; অত্যন্ত সহজ সরল সৌজন্য ও উদাসীনতা নিয়ে আমরা সবাই দু'খানি ব্যাঘ্রচর্মের উপরে নিতান্ত কাছাকাছি বসেছিলাম। সেদিনও পরিচয় পাইনি, আজো আমার

অজ্ঞাত—কে সেই দুটি তরুণী, মায়িজিই বা তাঁদের কে, কোথায় তাঁদের পথ !

এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ব্রহ্মচারীর কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে উপরে উঠলাম।

পরদিন আবার পথ হাঁট্‌চি। ব্রহ্মচারী চল্‌চে, অঘোরবাবু এগিয়ে যাচ্চেন। বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তা একটু ঘনিষ্ঠ হয়েচে, অঘোরবাবু আনন্দ পেয়েচেন, বউটি বড় বোনের মতো ব্যবহার করতে শুরু করেচেন। তাঁর চোখে ও মুখে সস্নেহ হাসি, আলাপে আন্তরিকতা, দুই করতলে সহোদরার সেবা ও যত্ন, তাঁকে কাছে পেয়ে যে-কোনো পথচারী সৌভাগ্য জ্ঞান করবে। ছতোলী ও মঠচটি পার হয়ে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ক্লান্তপদে আমরা সেদিন রামপুর চটিতে এসে পৌঁছলাম।

কিন্তু হঠাৎ বিপত্তি ঘট্‌লো। শাশুড়ীর পায়ে উঠেচে মস্ত বড একটা ফোস্কা, হাঁট্‌তে তাঁর ভারি কষ্ট হচ্চে। সবাই অত্যন্ত বিপন্ন হ'লেন। এদিকে ঘট্‌লো আর এক কাণ্ড। ব্রহ্মচারী ও অঘোরবাবু নীচে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠলেন। তর্ক করতে করতে অঘোরবাবু ব্রহ্মচারীর প্রতি ব্যক্তি-গত কটাক্ষ করে বসলেন। ব্রহ্মচারী নাকি অলস ও আরামপ্রিয়, আহারাদির সময় ছাড়া আর তার দেখা পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মচারীর আত্মসম্মানে বোধ হয় আঘাত লাগলো, ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'আমি কারো পরোয়া করিনে মশাই, খেতেই না হয় দিচ্চেন, তা বলে অপমান করতে পারেন না।'

অঘোরবাবু বলে বসলেন, 'আপনার মত লোককে আমার জানা আছে।'

অতএব ব্রহ্মচারী চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। পূর্ণ বিশ্বাস ভগবানে থাকলে দিন তার চলেই যাবে—এই কথা বলে সে বাঁধা-ছাঁদা শুরু করে দিল। আমাকেও চলে যেতে হবে,—প্রথমত এতটুকু করে রোজ পথ হাঁটলে আমার চল্‌বে না, দ্বিতীয়ত ব্রহ্মচারীকে ছেড়ে থাকাও কঠিন। রান্নাবাড়া প্রায় শেষ করে ছিলাম, ব্রহ্মচারী আজ খেতে রাজী হ'লো না, নীচের দোকানওলার কাছে আটা নিয়ে জলে গুলে খেয়ে বললে, 'আমি এখানে অপেক্ষা করি, আপনি সেরে নিন, না-হয়ত এগোই দাদা. কি বলেন?'

বুঝলাম এখানে একদণ্ড সে আর থাকতে চাইচে না, রাগে সে কাঁপছিল। বললাম, 'যা সুবিধে হয় করো।'

সেই রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ দিনটি আজো আমার চোখে জ্বল্‌জ্বল্ করচে। আহারাদির পর নিরুপায় হয়ে বিদায় নিতে গেলাম। অঘোরবাবু দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু সঙ্গে থাকলে আমরা খুশী হতাম, ও যাচ্ছে যাক্, অবশ্য আপনার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, কি করবো বলুন, এঁদের জন্যেই আমাকে এমন

আস্তে আস্তে—'

ওঁর শাশুড়ী-বউয়ের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। একটু ভিতরে গিয়ে দেখি মা ও মেয়ে কোলের কাছে ভাত নিয়ে বসেচেন মাত্র, কিন্তু ছোঁন্‌নি। মেয়ে বললেন, 'আপনি চলে যাচ্ছেন, মায়ের চোখ দিয়ে যে জল পড়চে!'

'কেন?'

'কেন!' বলে তিনিও মুখ তুলে তাকালেন, এবং তাঁর চক্ষুর দিকে তাকাবারও আর উপায় ছিল না! বললাম, 'কি করবো বলুন, যেতে আমাকে তাড়াতাড়ি হবেই, আবার কখনো দেখা হয়ত হবে আপনাদের সঙ্গে—'

বউটির চক্ষু আর বোধ করি বাধা মানলো না, জলভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'একটিমাত্র ছোট ভাই আমার ছিল, সে আপনারই মতন…সে আর নেই!—মা, ছেলের সঙ্গে তুমি কথা বলো।'

মা তাকালেন মুখ তুলে। বললাম, 'ঠিকানাটা না-হয় দিন্, দেশে যদি ফিরি কোনোদিন তা হ'লে—'

শরীর আর মনের ক্লান্তি নিয়ে সেদিনের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বেরিয়ে পড়তে হোলো। বহুদূর পথ চলতে চলতে একসময়ে ঝোলাঝুলি নামিয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। কিন্তু বস্‌বার শক্তিও আর ছিল না, দেহ বিস্তার করে শুয়ে পড়লাম। আঃ

আর যেন উঠতে না হয়, সকল জ্বালার অবসানে আসুক প্রশান্ত মৃত্যু। ছায়া নেই, মুখের উপর সূর্য জ্বল্‌তে লাগলো ; জল নেই, ভিতরটা হা-হা করচে !

অপরাহ্ণের রৌদ্র ম্লান হয়ে এলো। শুয়ে শুয়ে অসহ্য অস্থিরতায় গড়াগড়ি দিয়ে একবার বমি করলাম। তবু এক সময় ধূলায় বালিতে বমিতে চোখের জলে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে উঠে আবার চল্‌তে শুরু করলাম। অগস্ত্যমুনির মন্দির ও সৌরী চটি পার হয়ে গেলাম। একটু একটু করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, পথে আর কোন সঙ্গীর দেখা মিল্‌চে না। আকাশে চন্দ্র দেখা দেবার কথা, কিন্তু দেখতে দেখতে মেঘ করে এলো, জ'লো হাওয়া বইতে লাগলো। মনে মনে আশা আছে, চন্দ্রাপুরী চটিতে গিয়ে আজ ঠিক পৌঁছতে পারবো। শরীর দুর্বল, বাতাসের সঙ্গে দুল্‌চে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো চারিধারে, ঘুমের ঘোরে যেন পথ চলেচি। পথের রেখা কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্চে, তার পরে সমস্তটা অদৃশ্য হয়ে গেচে। কোথায় ব্রহ্মচারী ? আর সাহসে কুলোচ্চে না, উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রালোক নিবে গেচে, এত অন্ধকারে কোনদিন পথ হাঁটিনি। বাঁ দিকে নীচে বনবেষ্টিত নদী কুলু কুলু বইচে, দক্ষিণে ও মাথার উপরে পাহাড়ের পর পাহাড় অরণ্যের আঁধারে আবৃত,—গা এবার ছম্‌ ছম্‌ করে উঠলো। নিজের পায়ের শব্দেই এক একবার নির্জনে চকিত

হয়ে উঠছি ! লাঠির উপরে জোর দিতে সাহস পাচ্ছিনে। ভয়ে কানের ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করচে, পা কাঁপচে।

'কৌন্ হ্যায় ?'

হঠাৎ ভয়ে আঁৎকে থর থর করে কেঁপে উঠলাম। আকস্মিক কণ্ঠস্বরে বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করতে লাগলো। একটা ছায়ামূর্তি কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েচে। লাঠিটা জোরে বাগাতে গেলাম, হাতের লাঠি শিথিল হয়ে এলো। ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনে মনুষ্যমূর্তি বলে ধারণা হ'লো। কম্পিতকণ্ঠে বললাম, 'তুম্ কৌন্ হ্যায় ?'

'ম্যয় জেনানা !'

স্ত্রীলোক ! অন্ধকারে তার মুখের কাছাকাছি গিয়ে তাকে লক্ষ্য করলাম। ধীরে ধীরে লাঠির উপরে জোর এলো, সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কে বলে আমি নার্ভাস ! যতদূর বোঝা গেল, মেয়েটি পাহাড়ী, বয়স বেশি নয়, গলায় তার কয়েক-ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুলের চূড়ায় বড় একটা পালক, সম্ভবত পরনে গেরুয়া, দুই হাতে ফুল ও রুদ্রাক্ষের গহনা, ডান হাতে কমণ্ডলু এবং বাঁ-হাতে একটা শিঙা, নগ্ন পদ। চকিত ও চঞ্চল মেয়ে।

'কেয়া দেখ্‌তা হ্যায়, সাধুজী ?'

'তুম্ জেনানা হ্যায় ?'

'জি। হিঁয়া কেঁও খাড়া হুয়া হ্যায় ? কাঁহা যাওগে ?'

'চন্দ্রাপুরী যানা, রাস্তা ছুট্ গিয়া।'

'চ্ছা, পরদেশী ! আও মেরি সাথ, বাৎলাতে হেঁ।' বলেই ভৈরবীটি এগিয়ে চল্‌লো। কিন্তু তারও পথ ছিল না, দেখলাম এক লীলায়িত ভঙ্গীতে নদীর ভাঙন বেয়ে জলের দিকে সে নামতে লাগলো। আশ্চর্য, তার যেন বাধা-বিপত্তি নেই; যেন তার গৃহাঙ্গনের মতোই পরিচিত পথ, এঁকে-বেঁকে হেলে-দুলে হেসে-নেচে সানন্দে সে নাম্‌তে লাগলো। অতি কষ্টে বসে গড়িয়ে অতি সন্তর্পণে তার অনুসরণ করে নাম্‌তে লাগলাম। অনেকখানি নেমে গিয়ে বাকিটুকু থাকতেই সে হঠাৎ সবস্ত্র নদীর চড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লো,—তার ভিতরে যেন দুরন্ত রক্তধারা, প্রাণবন্যা নদীর অবলীলা ! তার লাগলো তিন মিনিট, আমি নামলাম দশ মিনিটে। নদীতে নেমে সন্তর্পণে দু'জনে হেঁটে জল পার হয়ে এপারে এলাম—সে আগে, আমি পিছনে পিছনে। কাছেই আর একটা ঝরনা নেমে এসেচে, তার উপরে আমাকে তুলে দিয়ে সে অদূরে চন্দ্রাপুরীর পথটা দেখিয়ে বিদায় চাইলো। বিদায় ত তাকে দেবোই, কিন্তু এতক্ষণে হঠাৎ যেন চমক ভেঙে গেল। ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে এই অকস্মাৎ-আবির্ভূতা কপালকুণ্ডলার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমারা ঘর কাঁহা ?'

'বহুৎ দূর হিঁয়াসে ! চল্‌তেঁ হেঁ,—যাও তুম্‌, আরাম করো !' বলতে বলতেই সে নদীর প্রস্তর-পথে দ্রুতপদে চল্‌তে লাগলো। চারিদিকে ঘনান্ধকার কালিবর্ণ পর্বতরাজি, তারই গভীর গহ্বর থেকে উন্মাদিনী চন্দ্রার প্রবাহ অন্ধবেগে ছুটে আসচে, সেই নদীর



চন্দ্রাপুরী চটি

উপর দিকে রহস্যময়ী মেয়েটি কিছুদূর গিয়ে নিশীথিনীর অঞ্চলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় তার বাসা, কত দূরে কোন্ গহন-গভীরে, কে জানে; নির্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে শুধু সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই বিচিত্র ঘটনাটি আজ নিজের কাছেও আমার স্বপ্ন বলে মনে হয়।

চন্দ্রাপুরীতে পৌঁছে গোপালদা ও ব্রহ্মচারীকে আবার পেলাম। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন। বাঁচলাম। আমার সব যাক্, গোপালদা ও ব্রহ্মচারীকে আর ছাড়তে পারবো না! আহারাদির পর বসে শেষের এই ঘটনাটা বললাম। কিন্তু তাতে আবার একটি ক্ষুদ্র নাটক স্বষ্টি হ'লো। এ ক'দিন আমি নাস্তিক ও অধার্মিক বলে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলাম। গল্পটা শুনে হঠাৎ বুড়ীর দল এগিয়ে এসে আছ্ড়ে পড়ে বলতে লাগলো, 'কে বাবা, মানুষের ছত্মবেশে কে বাবা তুমি? আমরা পাপী, অধম, তুমিই বাবা দর্শন পেয়েচ সেই মা ভগবতীর! কোন্ দিকে সে গেল বাবা, কোন্ পথে? তুমি জড়িয়ে ধরলে না কেন বাবা, পায়ের ধুলো কেন নিলে না? আহা, তুমি ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, তোমার মতন মহাপুরুষ···আমাদের অপরাধ নিয়ো না বাবা, তুমি যে কে আমরা এতদিনে—'

হাসি চেপে চোখ বুজে বসে ছিলাম, এবারে দুই হাত বাড়িয়ে বরাভয় দিয়ে দেবজনোচিত কণ্ঠে বললাম, 'সম্ভবামি যুগে যুগে!'

চারুর-মা চুপি চুপি এসে পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল।

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

সমতল পথ ও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভীরীচটি পার হয়েচি। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকানন্দাকে বিদায় দিয়ে মন্দাকিনীকে ধরেচি। মন্দাকিনীর ওপারে ভীমসেন ও বলরামের মন্দির পড়ে রইলো। তারপর এলো কুণ্ডচটি। এখান থেকে কেদারনাথের বরফ দৃষ্টিগোচর হ'লো। তুষার-কিরীট হিমালয়, সূর্যকিরণ-স্নাত দুগ্ধ-শুভ্র পর্বতমালা, বর্ণের উজ্জ্বলতায় রোমাঞ্চকর, নয়নাভিরাম রূপ। তারপরেই আবার পথ চড়াই, সেই প্রাণান্তিক পথ-অতিক্রমণ, পিপীলিকার মতো মন্থরগতি। কয়েক পা এগোই, একটু দাঁড়াই, কোনো অর্ধচেতন যাত্রীর মুখে একটু জল দিই, নিজে হয়ত একটু খাই, আবার কিছুদূর এগোই। এমনি করে এসে পেঁ ছিলাম গুপ্তকাশীর ধর্মশালায়। ছোট্ট একটি শহর। খান পনেরো-কুড়ি ধর্মশালা, কয়েকটি দোকান, বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, দূরে একটি ডাকঘর, সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন পর্বত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কোথাও অল্প অল্প কুয়াশা, নীচে পর্বতের সানুদেশে চিত্রপটের মতো ক্ষুদ্র এক একখানি পাহাড়ী গাঁও। কোথাও কোথাও সামান্য আবাদ। ধর্মশালাগুলি বেশ সুসজ্জিত ও কারুকার্যময়। এতদিনে আমাদের শীতের কাঁপুনি লাগলো। এবার শীতের দরজায় এসেচি, বসন্তকাল ফুরিয়ে গেচে, বরফ সন্নিকট। এখানে গোমুখী ধারা, মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান এবং গুপ্তদানের মাহাত্ম্য! পথের উপর থেকে গুপ্তকাশীর রূপটি সুন্দর! দূর ওপারে উখীমঠ শহরটি ছবির মতো দেখা যায়। শীতের সময় এ সকল পথ ও

শহর বরফে আচ্ছন্ন থাকে, মানুষ ও জানোয়ার সব নীচের দিকে পালিয়ে যায়।

আজ পর্যন্ত আমরা প্রায় একশো কুড়ি মাইল হেঁটেচি, হাঁটুতে আমাদের কষ্ট নেই, কিন্তু চড়াই-উৎরাই পাহাড়ের পথে হাঁটায় সামান্য এক মাইল পথ শতগুণ হয়ে ওঠে। যাই হোক, বেলা থাকতেই আমরা গুপ্তকাশী থেকে যাত্রা করলাম, কিছুদূর গিয়ে ডাকঘর দেখে মনটা একবার দুলে উঠলো। কিন্তু কা'কে চিঠি লিখবো ? মনের ভিতরে সবাই অতল তলে তলিয়ে গেচে। থাক্—জয় কেদারনাথ-কি জয়! মাইল-খানেক এসে নলাশ্রম চটিতে পোঁছলাম। এখানে চটিওলার কাছে গুরুভার মালপত্র রসিদ নিয়ে জমা রেখে কেদারনাথের দিকে যাবার ব্যবস্থা আছে, ফেরবার মুখে আবার জিনিসপত্র ফেরত নিয়ে যাত্রীরা উখীমঠের দিকে যায়। ঝোলাটা রেখে যাবার সুযোগ পেয়ে বাঁচলাম, সমস্ত পথ ঐ ঝোলা আর কম্বল আমাকে শাস্তি দিয়েচে।

রসিদ নিলাম বটে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে চটিওলা যদি ফেরত না দেয় ত বাঁচি, আর আমি ওর মুখদর্শন করতে চাইনে। নলাশ্রম থেকে এক মাইল দূরে ভেতাদেবী চটি, এখানে একটি কুণ্ড ও প্রাচীন মন্দির দণ্ডায়মান। তার পরেই আবার পথ চড়াই। চড়াই দেখলেই কান্না পায়, বুকের রক্ত শুকোয়। পুরো ২' মাইল চড়াই পার হয়ে পেলাম বুঙ্গমলা চটি। শোনা গেল এখানে ভগবতীর মন্দিরে অনেক মহাত্মার দেখা পাওয়া যায়।

যাক্ মহাত্মায় আর রুচি নেই। এখানে কাঠের বাসন সস্তায় বিক্রি হয়। বুঙ্গমলার পর আবার উৎরাই; চড়াই আর উৎরাই মানে একটি করে পাহাড় পার হওয়া। জনশ্রুতি, সবসুদ্ধ এক লক্ষ পাহাড় অতিক্রম না করলে বদরীনারায়ণ পৌঁছানো যায় না। মাইল-দুই পথ এসে পেলাম মৈখণ্ডা। এখানে আছে মহিষমর্দিনী দেবীর মন্দির এবং নদীর উপরে ঝোলা দড়ির পুল। উত্তর দিকে পথ ঘুরলেই দূরে তুষাররাজ্য চোখে পড়চে। রৌদ্রের সময় অপূর্ব রূপ। উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ, তার নীচে ধবল তুষার-রেখা, আবার তার নীচেই সবুজ অরণ্যময় পর্বতরাজি—পিছনের পটভূমিকায় তিনটি বর্ণের বিস্ময়কর সমাবেশ। ভিতর থেকে কেমন যেন অননুভূত আনন্দ গুঞ্জন করে ওঠে। আরো এক মাইল এসে ফাটা চটি পাওয়া গেল। এখানে একটি সরকারি ধর্মশালা ও পানচাক্কী আছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার আসন্ন হয়ে এলো। আজকের মতো এইখানেই বিশ্রাম। কিন্তু আশ্চর্য, ব্রহ্মচারী গেচে এগিয়ে, কাল থেকেই সে আমাদের এড়িয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করচে, কোনো তাৎপর্য বুঝলাম না। এখান থেকে বদলপুর চটি সাড়ে তিন মাইলের কাছাকাছি, রাত্রি সন্নিকট, বদলপুরে সে পৌঁছতে পারবে কিনা কে জানে। চিন্তিত মনে গোপালদা ও বুড়ীর দল নিয়ে চটিতে উঠে এলাম। ব্রহ্মচারীর মনে কোথায় যে ভাঙন ধরেচে কিছুই বুঝলাম না। ভগবানের প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস গোপালদাকে মুগ্ধ করেনি, কি

আমি যে তাকে অন্তরঙ্গ বলে মেনে নিয়েচি!

পরদিন ভোরে অন্ধকার থাকতেই যাত্রা। শীত পেয়ে পথ হাঁটার সুবিধা হ'লো, সহজে ক্লান্তি আসে না। প্রথমটা ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট হয়, তারপরে শরীর ঈষৎ গরম হয়ে উঠলে ভালোই লাগে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলেচি। শূন্য মন, ব্রহ্মচারীর অভাব-বোধটা মনে মনে এক একবার পদচারণা করে যাচ্চে, পথে সমবয়সের সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া বড়ই কষ্টকর। দুঃখ ও আনন্দবোধটা সমবয়সের ক্ষেত্রে একই জায়গায় এসে মেলে, সহজেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। একটু একটু করে সকালের আলো ফুটলো, আকাশে আকাশে প্রসারিত হ'লো প্রভাতের নিঃশব্দ সমারোহ, পর্বত-চূড়াগুলি লোহিত রৌদ্রে ঝলমল করে উঠলো,—আমরা চলেচি মন্থর গতিতে। বদলপুর চটিতে এসে মিনিট কয়েক বিশ্রাম নিলাম। বিশ্রাম নিয়ে আবার অগ্রসর হলাম। পথটা একটু সমতল মনে হচ্চে, পায়ে আর তত লাগচে না। মাথা নীচু করে চলেচি, কিছুই ভাবচিনে, কেবল হাঁটা ছাড়া আর আমাদের কোনো কাজ নেই। পথের পাশে কুন্দ ও কুরুবকের ঝাড়,—তা হোক, চল হাঁটি। গৌরীফল, ডালিম ও আখ্‌রোটের বন,—বেশ ত, চল হাঁটি। কোথাও জলপ্রপাত হচ্চে হু-হু শব্দে, কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে নাম্‌চে ঝরনা,—নামুক, আমাদের হাঁটতে হবে ত! চটি থেকে একটা

পাহাড়ী কুকুর সঙ্গে সঙ্গে আসচে, প্রায়ই যেমন আসে, যুধিষ্ঠিরের পাশে ছদ্মবেশী ধর্মের মতো, কত দূরে যাবে কে জানে। সেদিন হিসাব করে দেখেছিলাম একটা কুকুর প্রায় বিশ মাইল পথ আহারের লোভে অনুসরণ করে এসেছিল। পথে বহু যাত্রীর সঙ্গেই একটা করে কুকুর দেখা যায়। এ পথ যে মহাপ্রস্থানেরই তা'তে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। চল্‌তে চল্‌তে পাহাড়ের একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। গোপালদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মতো হাঁপাচ্ছিলেন, পথশ্রমে চোখের দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সেই বিপুল অবকাশের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে দাঁড়ালে উত্তর দিকে দূরদূরান্তর পর্যন্ত দৃষ্টি ছুটে যায়। পথটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে ঘুরে গেচে। অনেক দূর গিয়ে পথ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটি পাকদণ্ডী আকারে উপরে উঠেচে, আর একটি গেচে মন্দাকিনীর দিকে। মনে হ'লো পথের সংযোগ-স্থলে ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর মতো ব্রহ্মচারীকে নড়তে দেখা যাচ্চে। পিঠে ঝুলানো সবুজ কম্বল ও আরক্তিম গৈরিক বসন,—ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কেউ নয়! বার দুই চীৎকার করে উঠলাম, হাত তুলে নাড়লাম, কিন্তু নিস্ফল, তার কানে পৌঁছলো না, তেমনি করেই সে নীচের পথে হাঁট্‌তে লাগলো। ছুটে গিয়ে ধরবার উপায় থাকলে ধরে ফেলতাম, এমন করে তাকে নিষ্ঠুর হতে দিতাম না। আমি ছাড়া তার চরিত্রের ভিতর থেকে কেউ আনন্দ পায় না, আমি তাকে ভালবেসেচি।

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

বেলা আন্দাজ ন'টার সময় আমরা ত্রিযুগীনাথের পাকদণ্ডী-পথ স্পর্শ করলাম। পথের আর একটি শাখা নীচে মন্দাকিনীর তটে নেমে গেচে। প্রথমটা বিশেষ বুঝতে পারিনি, কিন্তু শ'দুই গজ আন্দাজ চড়াই উঠে আমি ও গোপালদা পরস্পর মুখের দিকে তাকালাম। পথ যেমন বন্ধুর তেমনি দুরারোহ। দুই পাশে ঘন জঙ্গল, কোথাও কোথাও পত্রপল্লবের ভিতর ঝরনার ঝর-ঝরানি, গিরগিটির অবিশ্রান্ত ডাক, ছায়াময় নিঃশব্দতা। দেয়াল বেয়ে যেমন টিক্‌টিকি ওঠে, তেমনি করে উঠচি, খাড়াই পথ প্রায় বুকের কাছে ঠেকচে। থাম্‌চি আর হামাগুড়ি দিচ্চি।

চার মাইল বিশাল চড়াই এমনি করে পার হয়ে ত্রিযুগী-নারায়ণে এসে পৌঁছলাম। গ্রামের নাম রায়ণা। গঙ্গোত্তরী হয়ে আর একটি পথ এখানে এসে মিলেচে। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করেই গ্রাম। শীতের হাওয়ায় জবু-থবু হয়ে গেলাম। ভীষণ মাছির উৎপাত। রান্না করবার আর শারীরিক সঙ্গতি ছিল না। মন্দির দর্শন করতে গিয়ে দেখি ভিতরটা ঝুপ্‌সি অন্ধকার, নাটমন্দিরে একটা বড় পাথরের খাপ্‌রার মধ্যে ধুনি জ্বল্‌চে! জ্বল্‌চে ত্রেতা যুগ থেকে—কোনো মুহূর্তেই নির্বাপিত হয় না। শীতের দিনে আগুনে কাঠ জুগিয়ে পাণ্ডারা নীচে নেমে যায়, গ্রীষ্মকালে এসে মন্দিরের দরজা খুলে দেখে ছাইচাপা আগুন—অন্তত এই কথাই প্রকাশ। কোনো তথ্যেরই সত্যাসত্য নির্ণয় করার রুচিও নেই, উৎসাহও নেই। বোঝা গেল, সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ

দু'খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সাড়া ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিল্পকলা, ধর্ম ও আচার, শাস্ত্র ও দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দু'খানি মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে যে গড়ে উঠেচে তাতে আর সন্দেহ নেই। নন্দির দর্শন করে দোকানদারের কাছে পুরি ও তরকারি কিনে চটিতে এসে উঠলাম। বেলা আন্দাজ তিনটে। তা হোক, আজকে আর পাদমেকম ন গচ্ছামি।

পরদিন প্রভাতে শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে ত্রিযুগীনাথ থেকে দ্রুতগতি অবতরণ। উৎরাইয়ে পায়ের ব্যথাটা বাড়তে লাগলো, তা হোক, ক্ষিপ্রগতিতে নেমে চলেচি। সবাই জলস্রোতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে হু-হু করে নামচে। উৎরাইয়ে সকলেরই একটু আরাম, কেবল আমারই দুঃখ। আজ দুঃখের কথা বললে গোপালদা আর শুনবেন না। বোঝা গেল লোকটির পথ চলার অভ্যাস আমার চেয়ে অনেক বেশি। আজ ব্যবস্থা হয়েচে, গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজন করা হবে। পথ হাঁটাই যেন মুখ্য, ভোজন ও শয়নটা গৌণ। মাইল দুই পথ নেমে এসে ছোট্ট একটি মন্দির, তারই দুই ধার দিয়ে পথ নেমেচে মন্দাকিনীর দিকে। সর্পাকৃতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পথরেখা, দু'ধারে পাহাড়ী বন। গ্রামের কোনো কোনো ছেলে-মেয়ে পাই-পয়সা ভিক্ষা চাইতে ছুটে এল; বড় বড় মেয়েরা তাদের শিখিয়ে দিচ্চে পিছন থেকে; ভিক্ষাবৃত্তি এদের পেশা নয়, প্রয়োজন। প্রায় মাইলখানেক পাকদণ্ডী পথে গড়গড়িয়ে নেমে মন্দাকিনীর পুল পেলাম।

রুদ্রপ্রয়াগের পর এই প্রথম নদী, পার হয়ে আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। মাইল-পোস্টে দেখা গেল, এখান থেকে কেদারনাথ আর মাত্র মাইল নয়েক। পাহাড়ে উঠতে উঠতে দেখি, পিছন দিক থেকে আর একটি ছোট খরস্রোতা নদী, নাম দুধগঙ্গা, মন্দাকিনীরই শাখা,—মন্দাকিনীতে এসে মিলেচে। আমরা দুধগঙ্গার ধারে সুউচ্চ পর্বতের গা বেয়ে চললাম। বেলা আন্দাজ দশটা, শীতের হাওয়া; রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, আমরা পর্বতের গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ হাঁটচি। এবার আমার এগোবার পালা, চড়াইতে পায়ে ব্যথা কম লাগে, এক একজন অগ্রগতিশীল যাত্রীকে দম্ভভরে অতিক্রম করে এগিয়ে এগিয়ে চলেচি। বন-জঙ্গলের বাঁকে-বাঁকে ছায়ায়-ছায়ায় সবাই তটস্থ হয়ে দল পাকিয়ে হাঁটচে। শোনা গেল এদিকে জানোয়ারের ভয় আছে।

প্রায় দ্বিপ্রহর বেলায় এসে পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ডের গ্রামে। গ্রামের কোলের উপর দিয়েই বইচে মন্দাকিনী। ক্ষুদ্র নদী, কিন্তু প্রচণ্ড বেগবতী। জল বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, সদ্যতুষার-বিগলিত, স্নান করবার উপায় নেই। রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই স্নান আমাদের বন্ধ হয়েচে। গৌরীকুণ্ডে গৌরীর মন্দিরের পাশেই একটি চটিতে এসে উঠলাম। সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্চে। যে বস্তুটির নাম গৌরীকুণ্ড তার দর্শন মিল্‌লো এতক্ষণে। প্রকাণ্ড একটা উষ্ণ জলাধার। কোন্‌ অলক্ষ্য পর্বতচূড়া থেকে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ উদ্ভূত হয়ে এখানে নেমে এসেচে। যাত্রীরা সেই গরম জলের ধারে

বসে তর্পণ জুড়ে দিল। বাস্তবিক, এই শীতপ্রধান দেশে ফুটন্ত জল থেকে ধূম-নিঃসরণ দেখে মনটা উল্লসিত হয়ে উঠলো। জল এত গরম যে, তার ভিতরে হাত-পা রাখা যায় না। অথচ কোনো কোনো যাত্রী পুণ্যের লোভে বাহাদুরি দেখিয়ে উত্তপ্ত জলের ভিতরে নেমে মিনিটের পর মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো। পুণ্য-সঞ্চয় তারা করবেই।

এবেলায় আর বিশ্রাম নয়, সকলের শরীরেই উৎসাহ রয়েচে, বেলাবেলি রামওয়াড়ায় পৌঁছে রাত্রির মতো বিশ্রাম নেওয়া যাবে। আগামী কাল প্রাতে চিরতুষারাচ্ছন্ন, বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষার, বহু স্বপ্ন ও তপস্যার কেদারনাথ-মন্দিরে পৌঁছুতে হবে। আজ সমস্ত রাত শক্তির সাধনা করবো। বরফ স্পর্শ করতে আর আমাদের দেরি নেই।

গৌরীকুণ্ড ছেড়ে অগ্রসর হলাম। শীত ধরেচে। সমস্ত পথটাই চড়াই। খুঁড়িয়ে হাঁটতেও আর কষ্ট নেই, সব সয়ে গেচে। আকাশ কোথাও কোথাও মেঘময়। একটু আগে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েচে। শীতের বাতাস কন্‌কনিয়ে বইতে শুরু করেচে। মাঝে মাঝে দলে দলে কেদার-প্রত্যাগত শীতার্ত যাত্রীর দেখা মিল্‌চে। পরস্পর দেখা হলেই 'জয় কেদারনাথ' বিনিময় হচ্চে। সকলেই যথাসাধ্য শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। সবাই একবার করে বলে যাচ্চে, 'সামাল্‌কে চলো ভাই, বহুৎ বরফ, জান্ বাঁচায়কে।' যতই এগোই ততই ভয়, একটা আসন্ন বিপদ যেন দূরে আমাদের

প্রতীক্ষায় রয়েচে। নানা শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা, কিন্তু গতি আমাদের মন্থর নয়, যথেষ্টই দ্রুত এবং সতর্ক। কোথাও পথ অতি সঙ্কীর্ণ, দলে দলে ছাগলের পিঠে খাদ্যবস্তু ও জ্বালানি কাঠের আঁটি বোঝাই নিয়ে এক একজন পাহাড়ী যাতায়াত করচে, সঙ্গে চলেচে গৃহপালিত এক একটা বড় কুকুর। পথে জানোয়ারের কবল থেকে ছাগগুলিকে রক্ষার জন্য একটি প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরই যথেষ্ট।

আমরা চলেচি বনময় পার্বত্য পথ দিয়ে। স্থানটির নাম চীর-বাসা ভৈরব। চেষ্টা করলে আজই আমরা কেদারনাথে পৌঁছতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেদারের পথ একেবারেই নিরাপদ নয়, আকাশও ঘন মেঘে এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার হয়ে আসচে, সম্ভবত বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত কিংবা শিলাবৃষ্টি হতে পারে, অতএব রামওয়াড়াতেই আজ আমাদের রাত্রিবাস। আমাদের পরম প্রিয় ছোড়িদার অমরা সিং এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সদ্বিবেচনার পরিচয় দিতে লাগলো। বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় আমরা রামওয়াড়ার চটিতে এসে উঠলাম, তখন সপ্ সপ্ করে বৃষ্টি নেমেচে। এত হাওয়া ও শীত যে খোলা জায়গায় এক মিনিটও দাঁড়াবার উপায় নেই। বুকের ভিতরটা শীতে এক একবার গুর গুর করে উঠচে, গায়ে কাঁটা দিচ্চে, তাড়াতাড়ি পুরু কম্বলখানি আশ্রয় করে বসে পড়লাম। দাঁতে দাঁতে জড়িয়ে যাচ্চে।

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

বৃষ্টি থামলো বটে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হ'লো না। চটির দেয়াল ও ছাউনি কাঁপিয়ে বরফের প্রচণ্ড বাতাস থেকে থেকে হু-হু শব্দে বয়ে চলেচে। গোপালদা কল্‌কে ধরিয়ে ভয়ে ভয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন।

রাত্রে চটিওয়ালার কাছে চার আনা দিয়ে একখানি লেপ ভাড়া করতে পেরেছিলাম, সুতরাং প্রভাতকালে আর ঘুম ভাঙলো না। না ভাঙবারই কথা, লেপের গরম। চেয়ে দেখি বুড়ো ইঁদুরের মতো গোপালদা আমার লেপের মধ্যে ঢুকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকাচ্ছেন। অম্‌রা সিং ও কালীচরণের ধমকের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই উঠে পড়লাম। লেপ ছাড়তেই বাইরের ঠাণ্ডাটা যেন চাবুক মারতে লাগলো। তড়িৎগতিতে বাঁধা-ছাঁদা করে যখন হি হি করতে করতে পথে নেমে এলাম তখন বেলা বেশ বেড়ে উঠেচে।

আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার! শোনা গেল বৎসরে কোনো কোনো দিন মাত্র এ-রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়। সম্মুখে সাদা তুষারময় পর্বতের কোলে-কোলে মেঘ ভেসে চলেচে। ঠাণ্ডায় পা ঠিক পড়চে না, মাতালের মতো ছন্দহীন হয়ে চলেচি। দাঁতের উপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্চে। ইচ্ছা করচে ছুটোছুটি করি। মুখে চোখে ছুঁচের মতো তুষারের হাওয়া বিঁধছে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারচিনে। পাকদণ্ডী পাহাড়ের পথ, দীর্ঘ লম্বা চড়াই নয়, গোলক-ধাঁধাঁর মতো ঘুরে ঘুরে উপরে

উঠচি। বুকের মধ্যে দম্ আছে প্রচুর, কিন্তু পা ক্লান্ত হচ্চে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠতে থাকি। আজ আমি আগে আগে। ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহহীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সম্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা, পথের ধারে ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েছে, ঝরনাগুলি সাবানের ফেনার মতো গলে পড়চে,—আজ আমি আগে-আগে। আজ আমার শরীরে ফিরে এসেচে পুরাতন শক্তি, বলিষ্ঠতা, দুরন্ত উদ্দীপনা, অপরিমেয় প্রাণলীলা। কোথায় হারিয়ে গেচে পিছনের পৃথিবী, কোথায় বিলীন হয়েচে পশ্চাৎ-জীবনের সমাজ সংসার ও আত্মীয় বন্ধুর দল,—আজ আমি আর বিশ্রাম নেবো না, তুচ্ছ দেহের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেবো না,—আজ বন্যার মতো অপ্রতিহত গতিতে ছুটে যাবো। আজ আমি আগে আগে, আগে আগে, ছুটে-ছুটে···

একবার দাঁড়ালাম। ছুটতে ছুটতে সকলকে পিছনে ফেলে এসেচি। চারিদিকে অকূল কুয়াশার মধ্যে কে কোথায় হারিয়ে গেচে, কেবল দেখা যাচ্চে দুইদিকের সামান্য পথরেখা। কোথাও বৃক্ষলতা নেই, বন-অরণ্য নেই, জীব-জানোয়ারের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তুষারময় পর্বতমালা, অসংখ্য ঝরনা চীৎকার করতে করতে পথের ধারে নেমে আসচে। বামে দক্ষিণে সম্মুখে পিছনে মেঘের ঘনঘটা, বিলুপ্ত আকাশ, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী। এবার চল্‌চি হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে, গর্জনমত্ত বায়ুবেগে, আর নিজেকে ধরে রাখতে

পারচিনে। ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠলো। সে-আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়, বিদ্যুৎ-বহ্নির নয়,—সে এক নতুন অলৌকিক আলো—তুষার-শুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো। আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোক-ধাঁধাঁ। চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এলো, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মতো সঙ্কীর্ণ পথরেখার উপরে পা বুলিয়ে বুলিয়ে হাঁট্‌চি। সে কী ভয়ানক সর্বনাশা আলোকের উগ্রতা, তীরের মতো চোখে এসে লাগে, যাত্রীরা পথভ্রষ্ট হয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল। উঠলো ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের মতো তুষারবৃষ্টি, তার সঙ্গে দানা-দানা জল। কী কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ, আর বুঝি আত্মরক্ষা হ'লো না, আর কতদূর আছে কে জানে,—মন্দির আর কতদূরে? মাথার উপরে পড়েচে বরফ, কাঁধে পড়েচে বরফ, কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে পারচিনে, পাগলের মতো ছোটবার চেষ্টা করলাম।

'আঁক্‌!'

পড়লাম পা পিছলে বরফের উপরে, পথ তুষারে ডুবে গেচে। এ কি, সত্যিই কি আমার শরীরে আর শক্তি নেই? শরীর পাথরের মতো অসাড় হয়ে আসচে কেন? এ কোথায় ছিট্‌কে পড়েচি? হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কম্বলটা খুঁজে পেলাম। আহা বেচারী কী দুঃখই সইলো আমার জন্য! কত নীচে পড়েচি বোঝা

গেল না, অনেক চেষ্টা করে চোখের পল্লব খুলে দেখি পাশেই একটা ছোট জলাশয় ঠাণ্ডায় জমে আয়নার কাঁচের মতো কঠিন হয়ে গেচে! গা ঝাড়া দিয়ে আবার উঠলাম, মিছরির ঢিবির মতো বরফের স্তূপে পা পুঁতে গেচে। লাঠিটা আছে খাড়া দাঁড়িয়ে বরফের মধ্যে। যাক্, এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম। কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডা উঠে পক্ষাঘাত হয়েচে, ঊর্ধ্ব দেহটা কেবল বাকি। নিজেকে টানতে টানতে এগোচ্চি, চোখ খুলতে পারলে দেখতাম আর কতদূরে! চোখে মুখে পড়েচে তুষার ও জলের বিন্দু, মাথার চুল ভারী হয়ে উঠেচে, পরনের গৈরিক-সজ্জা মোলায়েম তুষারে আচ্ছন্ন হ'লো। মিট্‌মিট্ করে একবার তাকাবার চেষ্টা করলাম। সম্মুখে তুষারের পুষ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মতো ঝলমল করচে, মাথার উপরে তুষারের চন্দ্রাতপ। কী অনির্বচনীয় রূপগৌরব! এ যেন কোন্ বিরাটের পদতল ছোঁবার জন্য উঠচি, যেন এক বিপুল বিশ্বের তোরণ-দ্বারে করাঘাত করবার জন্য পাগলের মতো, অন্ধের মতো হাতড়ে চল্‌চি—যেন স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের আজ আলিঙ্গন হবে।

শঙ্খধ্বনি শুন্‌চি। কাঁসর-ঘন্টার বুঝি আওয়াজ আসচে! কোন্ দিকে? উত্তর, না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুনলাম। কিন্তু আর যে চলতে পারচিনে, একটিবার শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেবো? কিন্তু শুলেই যে থাম্‌তে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। প্রাণের মধ্যে ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাচ্চি, সব ডুব দিচ্চে, —রূপ, আলো, শব্দ, চেতনা, নিশ্বাস,—সব। হাত-পাগুলো আর

কথা শুন্‌তে চাইচে না! একবার চীৎকার করে কাঁদতে পারিনে? একবার পারিনে ঝড়ের মতো হেসে উঠতে?

'মহারাজ-জী, কেঁও খাড়া হুয়া হ্যায়?'—হাতের উপরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম। হাতটা ধরে হিড় হিড় করে কয়েক পা টেনে নিয়ে গিয়ে লোকটি বললে, 'এ্যায়সা হোতা হ্যায় ঠণ্ডেমে, জল্‌দি-জল্‌দি আনা—'

'কোন্ হ্যায় তুম, ছাড়ো ছাড়ো—'

'আও জী, আঁখ্ খুলো, ম্যায় অম্‌রা সিং হ্যায়। আও, পুল্ আ গৈ।'—অম্‌রা সিং আমাকে টেনে নিয়ে চললো।

শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে চোখের পাতা মেলে একবার তাকালাম। তখন মন্দাকিনী-দুধগঙ্গার পুলের কাছাকাছি এসে গেচি। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দু'চারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্চে। পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু'একটি দোকান, পথগুলি পাথর-বাঁধানো। ঘর-দুয়ার, দোকান-পাট, পথঘাট সমস্তই কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা। তার উপর দিয়েই আনাগোনা চল্‌চে। খবর নিয়ে জানলাম গোপালদার দল এখনো অনেক পিছনে।

পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে



কেদারনাথ

বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেচে, এবারে আর তেমন কষ্ট হচ্চে না। এবারে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরচে, পায়ের চামড়া ফেটে গেচে। তা যাক্, বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে তখন জনকয়েক অর্ধ-উন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের উপর ওলোটপালট খাচ্চে। কেদারনাথ মূর্তিমান নন্, কর্কশ অসমতল বড় একখানা পাথরের খণ্ড,—তা হোক, তাকেই আলিঙ্গন করে কেউ হাসচে, কেউ কাঁদচে, কেউ চীৎকার করচে কেউ ধরেচে গান, কেউ করচে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি, কেউ বা শীতবিদীর্ণ রক্তাক্ত মুখে তাকে পাগলের মতো চুম্বন করচে! আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তব-মন্ত্র, স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ,—কিন্তু স্থাণু ও বধির প্রস্তর-স্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইলো। ভিতরটায় কালি-বর্ণ অন্ধকার ও কঠিন অসহ্য প্রাণান্তিক ঠাণ্ডা, পা পেতে দাঁড়াবার উপায় নেই; সম্মুখে এই পথশ্রান্ত পাগলের দল আত্মহারা হয়ে কোলাহল করচে! কী যেন ভেবে অন্ধকারে একবার নিঃশব্দে দাঁড়ালাম।

কিন্তু ভিতরের হিমগর্ভ অন্ধকারের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই, ঠাণ্ডায় মুহূর্তে মুহূর্তে সর্বশরীর অসাড় হয়ে আসে, গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে যায়, গলার ভিতর থেকে এক রকম

ভগ্ন, আর্ত আওয়াজ বিদীর্ণ হয়ে ছোটে। এদিকে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত যাত্রীদের প্রলাপ,—কারো মুখের কস্ বেয়ে গড়াচ্চে রক্ত, কারো ফেনা, হাতে-পায়ে হিমক্ষত, রক্তের দাগ, সর্বাঙ্গে তুষারের চূর্ণ কারো-কারো কণ্ঠস্বর বসে গেচে,—কিন্তু কেন? দুর্গমের এই বীভৎস পীড়নের ভিতর দিয়ে কোন্ দুর্লভকে তারা বরণ করতে এসেছিল? মন্দিরের অন্দরে প্রেতের মতো একাকী কিয়ৎক্ষণ টহল দিয়ে বেড়ালাম। ভিতরটা চির-অন্ধকার, ভয়ের বাসা, রহস্যের পাথার, সূচ্যগ্রপরিমাণ আলোক প্রবেশের পথ কোথাও নেই।

অন্ধকারের ভিতরে থেকে পা বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা দিয়ে বা'র হয়ে এলাম। হাত, পা, মুখ ঠাণ্ডায় বেঁকে যাচ্চে, নেমে এসে কোনোক্রমে জুতো জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে চললাম। হাতে লাঠি, তাকে চালনা করার আর শক্তি নেই, পায়ের তলায় বরফের চাপড়াগুলিতে মচ্ মচ্ করে শব্দ হচ্চে, অন্ধকার থেকে তুষারের আলোয় নেমে আবার চোখ বুজে আসচে—মুখে এক রকম শব্দ করতে করতে এসে ধর্মশালায় উঠলাম।

ছোট্ট পাথরের ঘরখানি বরফের গর্ভে সমাধিস্থ হয়ে রয়েচে। ভিতরে আমরা কয়েকজন যাত্রী। গোপালদা ও বুড়ীরা কম্বল জড়িয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে, কারো মুখে আর কথা নেই, চোখে ও মুখে সকলেরই প্রাণভয়ের চিহ্ন। বাইরে মেঘলা আকাশ, প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে তুষার ঝরে পড়চে,

—যতদূর পর্যন্ত কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা যায়, পাথরের ঘর-গুলির মাথায়, জানলায়, দরজায়, পথে-ঘাটে, দোকানগুলির চালায় স্তূপাকার বরফের কঠিন আবরণ। কোনো কোনো স্থানায় লোক লোহার অস্ত্র নিয়ে বরফ কেটে আপন চলাচলের পথ সুগম করচে। প্রত্যেকদিন দুবার চারবার করে তাদের অস্ত্র ধরতে হয়। সবাই যদি এদেশে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে তবে একদিন বরফে তাদের গ্রাস করবে। ঠাণ্ডায় শরীরে শক্তি জমে, গরমে শক্তি গলে।

এমন সময় অমরা সিং কতকগুলি কম্বল আর কাঠ এনে হাজির করলো। পাণ্ডারা এদেশে বিনামূল্যে কম্বল ধার দিয়ে যাত্রীদের সাহায্য করেন, কাঠও তাঁরা কিছু এমনিই আনিয়ে দেন। কম্বল এলো বটে কিন্তু সহজে সেগুলি স্পর্শ করা গেল না, তারাও বরফ হয়ে গেচে, ছুঁলেই হাত কন্‌কন্ করে ওঠে, গায়ে চাপালে শীতে হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। অমরা সিং একটা লোহার খাপ্‌রায় কাঠের আগুন জ্বাল্‌লো। আগুন দেখে আমাদের কী আনন্দ! ও যেন মৃতসঞ্জীবনী, ও যেন আমাদের সকলের লুপ্ত পরমায়ু! কাঠ এত ঠাণ্ডা যে ভালো করে জ্বল্‌তে চায় না, তবু সেইটুকু আগুনের চারিদিকে যাত্রীরা গিয়ে ঘিরে বসলো। কেউ তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়, কেউ দেয় পা। হাত-পা পুড়ে যাক্, ছ্যাঁকা লাগুক্, গ্রাহ্য নেই,—আগুন নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঝটাপটি, আগুন নিয়ে মনোমালিন্য। একজনের

শরীর একটু বেশি গরম হয়ে উঠলে আর একজন ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। বামুন-বুড়ীর সম্বন্ধে এমনো সন্দেহ হ'লো, সে হয়ত বা এইবার কাঠের আঙ্‌রাগুলি সকলের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের গায়ের উপরেই ছড়িয়ে দেবে! ইতিমধ্যে যাত্রীদের ভিতরে বামুন-বুড়ীর পর-পীড়ন ও আত্মপরতা সর্বজন বিদিত হয়ে উঠেচে। কোমরভাঙা চারুর-মা এতক্ষণ ঠাণ্ডার জ্বালায় কম্বল-রাশির তলায় আত্মগোপন করে ছিল, এইবার হঠাৎ একখানা কম্বল হাতে নিয়ে উঠে পাগলের মতো আগুনের দিকে এগিয়ে গেল, দিল কম্বলখানা আঙ্‌রাগুলির মধ্যে ঢুকিয়ে। একটি রোঁয়াও তার পুড়লো না, বামুন-বুড়ী হাঁ-হাঁ করে উঠতেই সে আবার সেখানা তুলে নিয়ে উঁচুতে ধরে কিয়ৎক্ষণ তাতালো, তারপর আবার এলো এগিয়ে। কাঠের মতো কঠিন ও নিশ্চল হয়ে এতক্ষণ একপাশে বসে ছিলাম, চারুর-মা হঠাৎ সেই গরম কম্বলখানা খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। বললে, 'সব আগুনটুকু ওরা চেটে খাচ্চে, তুমিও যে একটা মানুষ তা আর ওদের······কম্বলখানা একটুও গরম হয়নি, না বা'ঠাউর?' বলেই সে আবার সেই কম্বলরাশির তলায় গিয়ে ঢুকলো।

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা হয়ত ছিল কিন্তু শক্তি ছিল না। শুধু কেবল শীত-কাতর মুখখানা ফিরিয়ে এই স্নেহময়ী বৃদ্ধার দিকে তাকালাম। এই মেরুদণ্ডভাঙা চারুর-মা কঙ্কাল দেহখানিকে নিয়ে বরাবর হেঁটে চলেচে, অথচ আশ্চর্য, মুখে তার নিরন্তর

হাসি ও রসালাপ। এই বুড়ীকে সবাই করে তাচ্ছিল্য ও অনাদর, সামান্য কারণে ধম্‌কায় ও শাসন করে, কথায় কথায় সরস মন্তব্য করে বলে, অনেকের কাছেই সে পাগল, পয়সা-কড়ি খরচ ক'রে হিসাব রাখে না বলে' বামুন-মার কাছে সে লক্ষ্মীছাড়ী, অথচ চটিতে চটিতে দেখি অনেকের উচ্ছিষ্ট বাসন সে মেজে দেয়, কারো ধরিয়ে দেয় উনুন, মাঝে মাঝে দেয় মসলা পিষে, অপ্রার্থিত সেবায় সে সকলকে সুস্থ রাখবার চেষ্টা করে। এগুলি নিতান্তই সামান্য পরিশ্রম, কিন্তু পথশ্রান্ত অনড় যাত্রীদের পক্ষে এগুলি মহৎ উপকার হয়ে দেখা দেয়।

ঘরখানির চারিদিক বন্ধ, পাথরের মজবুদ ঘর, কোথাও একটি ছিদ্র নেই, বাইরের বাতাসকে সবাই বাঘের মতো ভয় করে—সেই বায়ুলেশহীন ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়ে সবাই বসে রইলাম। ধোঁয়ায় ও আগুনের আভায় ভিতরটা যখন একটু গরম হ'লো, তখন ফুটলো কারো-কারো মুখে কথা। বেলা তখন অনেক, হয়ত বারোটা হবে। একরাত্রি কেদারনাথে বাস করে' যাওয়া রীতি। অম্‌রা সিংয়ের সাহায্যে সেদিন পুরি ও আলুর তরকারির ব্যবস্থা করা গেল। আকাশের দুর্যোগ কমলো না, সূর্য নাকি এদেশে নেই, মেঘ ও কুয়াশায় চিরদিন এদেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কখনো তুষারের বদলে পড়ে বৃষ্টি, কখনো বৃষ্টির বদলে তুষার, সেই তুষার দেখতে দেখতে জমাট বরফে পরিণত হয়। বর্ষাকালের শেষ পর্যন্ত কেদারনাথে মানুষের

সমাগম থাকে, শরৎকাল পড়লেই সবাই নীচে নেমে যায়—পশু, পক্ষী ও মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। ঘরবাড়িগুলি বরফের তলায় কয়েক মাসের জন্য অদৃশ্য হয়ে থাকে। এই বাড়িগুলি ও পথঘাট নাকি বহু শতাব্দী পূর্বে নির্মিত, কিন্তু আজো যেমনি আন্‌কোরা তেমনি পরিচ্ছন্ন, কোথাও বিনাশের চিহ্ন নেই। খুব সম্ভব এই ঋতুর আবহাওয়ায় থেকে তাদের পরমায়ু এত দীর্ঘ হয়ে উঠেচে।

সমস্ত দিন আগুন জ্বালিয়ে কম্বল জড়িয়ে ঘরের ভিতর অকর্মণ্য হয়ে বসে রইলাম। কখন্ বিকাল গড়ালো সন্ধ্যার দিকে, কখন সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হ'লো, কিছুই বোঝা গেল না। চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো বটে কিন্তু ঠাণ্ডায় নিশ্চল হয়ে রইলাম, হাত-পা ছড়াবার শক্তি লুপ্ত হয়ে গেচে। শীতের অসহ্য ক্লেশ ও পীড়নের ভিতর দিয়ে সেই ভয়-ভীষণ রাত্রি অতিবাহিত করা গেল।

*   *

*

সেদিন প্রভাতে সেই আকাশের অবারিত দুর্যোগ, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, মেঘান্ধকার—তাদের ভিতর দিয়ে কেমন করে পালিয়েছিলাম, কেমন করে উৎরাই পথে রামওয়াড়া পার হয়ে সোজা গৌরীকুণ্ডে এসে পুনরায় থামলাম, তার কথা বলে' আর কাজ নেই। আগেকার পথ ধরেই আমাদের প্রত্যাগমন। দুদিনের পথ

পার হয়ে একদা মধ্যাহ্নে আমরা সেই নলাশ্রম চটিতে এসে উঠলাম। এখানেই আমরা কিছু-কিছু পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি ফেলে গিয়েছিলাম। এবারে আর শীত নেই, আকাশ নীলকান্তমণির মতো ঝলমল করে উঠেচে, সুন্দর আরামদায়ক রৌদ্র, আবার দেখা দিল অরণ্যে সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা, বসন্তকালকে বরণ করে নিলাম। এবারে পথ আবার নতুন। দক্ষিণের পথ গুপ্তকাশীর, সম্মুখের পথ গভীর নীচের দিকে মন্দাকিনীর তটে নেমে গেচে। আবার সেই প্রচণ্ড মাছির উৎপাত শুরু হ'লো, সেই আপাদ-মস্তক পোকা, গায়ের চুল্‌কানি, পায়ের হাঁটুতে সেই ব্যথা! নলাশ্রম চটিতে আহারাদি শেষ করে সেই পুরাতন ঝোলাঝুলি ঘাড়ে নিয়ে এই উৎরাই পথটি ধরে পুনরায় যাত্রা করলাম। শোনা গেল মন্দাকিনী পার হয়ে এখান থেকে উখীমঠ মাত্র তিন মাইল। আজ আমাদের উখীমঠ পৌঁছতেই হবে। কেদারনাথ শেষ করা হয়েচে, এবার একটু নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে,—এবার সোজা বদরিকাশ্রম, আর অন্য কথা নয়, এক লক্ষ্য!

কিন্তু হায়রে তিন মাইল! গড়গড়িয়ে যাত্রীর দল নামচে ত নামচেই, তিন মাইল আর শেষ হয় না। যাত্রীদের উৎসাহকে সজীব করে রাখার জন্য কোন্‌ মিথ্যাবাদী প্রচার করেচে যে, এই দীর্ঘ পথটা মাত্র তিন মাইল? পাকদণ্ডীর পথ ঘুরে ঘুরে যখন মন্দাকিনীর পুলের কাছে নেমে এলো তখন আমরা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে উঠেচি। পুল পার হয়েই আবার পথের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে

গেল। একেবারে খাড়াই পর্বত, বুক-বুক চড়াই, এবং সে-চড়াই যে কী ভীষণ তা অনুমান করাও কঠিন। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে পথের উপর রীতিমতো ভর দিয়ে চল্‌চি। সে ত' চলা নয়, হামাগুড়ি দেওয়া। এমন ভীষণ চড়াই গত দিন দুই আমরা অতিক্রম করিনি। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিচ্চি, মাঝে মাঝে কোনো কোনো আর্তযাত্রী মুখে একরকম শব্দ করে উঠচে, চলতে চলতে দেখি, পথের ধারে সেই খিদিরপুরের নির্মলা কাঁদতে বসেচে একেই ত সে পরিশ্রমের ভয়ে রান্না করে' খায় না, তার উপর এই চড়াই,—আহা বেচারা!

একটু দাঁড়াই, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে চায়, ত যাক্‌—আবার শামুকের মতো এগোই। ওপারে দূর পর্বতের চূড়ায় গুপ্তকাশীর ক্ষুদ্র শহরটি দে[illegible] যাচ্চে। কতদিন কতকাল আগে যেন ওই শহরটিকে পিছনে ফেলে এসেচি, অতীত জীবনের পৃষ্ঠায় ওটি যেন সামান্য একটুখানি স্মৃতির মতো জড়িয়ে রইলো। প্রতিদিন আমরা ভুলে যাই পূর্ব দিনটিকে, প্রতি প্রভাতে আমাদের হয় নবজন্ম। আমরা যেন চিরদিবসের তীর্থযাত্রী চির-তীর্থপথিক, জন্মজন্মান্তর পার হয়ে চলেচি চির-সুন্দরের পদপ্রান্তে; যে চিরদুর্লভ, যার জন্য এই দুর্গম পথযাত্রা, এই পীড়ন, যার জন্য এই যন্ত্রণাজর্জর পথের প্রাণান্তকর তপস্যা, সে রূপাতীত রূপকে আমরা চাই, সে আমার আশার পরিতৃপ্তি সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া! বুকের রক্ত শুকিয়ে দুস্তর পথ পা



একটি চড়াই

.য়ে যখন উখীমঠের ধর্মশালায় এসে পৌঁছলাম, দিন তখন শেষ .তে আর দেরি নেই। খুব ছোট শহর নয়। কতকগুলি বিশৃঙ্খল াগরিক সাজ-সরঞ্জাম এখানে-ওখানে ছড়ানো। যথা, একটি াজার, থানা, ছাপাখানা, হাসপাতাল ও কম্বলীবাবার সদাব্রত। উখীমঠের সংস্কৃত নাম উষামঠ। পুরাকালে এখানে বাণাসুরের াজধানী ছিল। আমাদের ধর্মশালার গায়েই প্রকাণ্ড মন্দির। এই মন্দিরে কেদারনাথের পূজারী রাওল মহাশয়ের বাসস্থান, ীতকালে কেদারনাথের উদ্দেশে এখান থেকেই পূজা নিবেদন করা হয়।

মন্দিরের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ টহল দিয়ে ঘুরে বাইরে চত্বরে এসে াসলাম। পাশেই একটা দোকান। দোকানটা বেশ মান্যগণ্য, তারই নীচে একখানা কাঠের চৌকি আশ্রয় করা গেল। মন্দিরের পাশেই পুলিসের থানা, তারই জমাদার দারোগা বেরিয়ে এসে চৌকির আর একপাশে বসে গল্প জুড়ে দিল। বোঝা গেল থানার ব্যয় আছে কিন্তু আয় নেই, মাইনে দিয়ে সবাইকে পুষে রাখা আর চল্‌চে না। থানার দারিদ্র্য শুনে এখানকার জনসমাজের সম্বন্ধে ভালো ধারণাই হয়। চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য সামাজিক অপরাধ কম, এমন দেশ এই গাড়োয়াল। দারোগাবাবুর হাতে একখানি পুরাতন ইংরেজি সংবাদপত্র দেখে চমকে উঠলাম! তবে কি আমরা সত্যই মরজগতে জীবিত অবস্থায় আছি?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লো, তার সঙ্গে নেমে এলো অপরূপ জ্যোৎস্না।

সম্ভবত আগামী কাল পূর্ণিমা। জানি এটা বৈশাখী পূর্ণিমা সেই শুক্লা চতুর্দশীর দিকে তাকিয়ে চোখে এলো ঘুম। কোথাও একটু চুপ করে বসলেই ঘাড় ভেঙে তন্দ্রা আসে। ঘুমোতে পারলেই আমরা বাঁচি; পথ হাঁটতে হাঁটতে আজকাল আমাদের চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। কখনো কখনো বহুদূর পথ হেঁটে গিয়ে হঠাৎ চমক ভাঙে, তাই তো, চলতে চলতে সত্যিই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিছু ত মনে নেই! হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের নাক ডাকার শব্দে নিজেরাই বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই। ঘুমের ঘোরে পাছে কোনোদিন পাহাড়ের গা থেকে পা পিছলে যায়, সেই আতঙ্কে সতর্ক হয়ে থাকি নাল্ বাঁধানো লাঠিটা শক্ত হাতে ধরে' ঠুকে ঠুকে চলি। পথের একদিকটা পাহাড়ের গা, অন্য দিকটা একেবারে আলগা সুতরাং পাহাড়ের গা ঘেঁষেই চলি। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন সম্বন্ধে আমরা নিরন্তর সন্ত্রস্ত, কেবলই আমাদের সতর্কতা; অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাকাই, প্রতিদিন প্রভাত থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে সবাই আমরা ক্লান্ত হয়ে উঠি। অথচ জানি একদিন আর পালাতে পারবো না, ধরা একদিন দিতেই হবে। আজ যারা নবীন, যাদের চোখে নতুন আলো, নব উদ্যম ও অনুপ্রেরণা, কাল তারা পক্ককেশ ও প্রবীণ, সংসার থেকে তাদের প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, তারা আবার ছুটলো মৃত্যুর গর্ভে। দুরন্ত উল্লাসে

বারে বারে তারা ছুটে আসে, দুর্দান্ত তাড়নায় বারে বারে তারা ছুটে পালায়। এর নাম জীবন।

আকাশ ও পৃথিবী প্লাবিত করে শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্রালোক ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো, পর্বতের চূড়ায়-চূড়ায় উজ্জ্বল নক্ষত্র-গুলি রইলো জেগে। বসন্তের বাতাস আপন উত্তরীয় উড়িয়ে ভ্রমণ করে ফিরতে লাগলো—মন্দির-চত্বরের একান্তে শুয়ে আমার চোখে এলো ঘুম।

পরদিন ভোর-রাত্রে আবার তল্পি-তল্পা কাঁধে নিয়ে সেই একটানা যাত্রা! যে-উখীমঠে পৌছবার জন্য এত আয়োজন ও আকর্ষণ, আজ তার প্রতি যাত্রীদের নির্দয় অবহেলা। আমাদের জীবন থেকে তার প্রয়োজন একেবারে শেষ হয়ে গেচে, সে পিছন থেকে সকরুণ দৃষ্টিতে আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমাদের ডাক এসেচে প্রভাতের দিকে, ডাক দিল শুক্রতারকা, আহ্বান এলো দূর-দূরান্তরের। রাত্রির আঁধার রইলো পিছনে, আলো পাঠিয়েচে তার নতুন সংবাদ, আমাদের যাত্রা শুরু হ'লো। ভোরের মুখচোরা বাতাস চলাচল করচে, পাখীর কলকাকলি জানাচ্চে আনন্দ-অভিনন্দন, পথের পাশে-পাশে বসন্ত-পুষ্পের সমারোহ, আকাশের দেবতা সুরঞ্জিত বরণডালায় উষাকে বন্দনা করচেন, তারই নীচে-নীচে তীর্থযাত্রীদের পথ। পথ কেবল চড়াই, কেবল উঠচে উপর দিকে, আমরা চল্‌চি গুটি-

গুটি। কারো এগিয়ে যাবার উপায় নেই, ছন্দটি ঠিক বজায় রেখে চলতেই হবে; যে দু'পা পিছনে থাকবে তাকে বরাবর পিছনেই থাকতে হবে। যদি সে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে দম্ ফুরিয়ে এক সময় তাকে বসে পড়তেই হবে। কেউ যদি বাহাদুরি প্রকাশ করে, পথ তার কাছে কড়ায় গণ্ডায় মূল্য আদায় করে নেবে। শক্তিমান এবং দ্রুতগামীর প্রতি বাবা বদরীনাথের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব একটুও নেই, দুর্বল এবং বলবানকে তিনি সমশ্রেণীভুক্ত করে কাছে টেনে নেন্।

কাঁথা চটি এবং গোলিয়া বগড় পার হয়ে আরো এক মাইল চড়াই অতিক্রম করে আমরা সেদিন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে অর্ধমৃত অবস্থায় দোয়েড়া চটিতে এসে পেঁৗছলাম। এই চটির মতো বন্ধু পথে আর কেউ নেই। পরিশ্রান্ত পথচারীকে সাদরে আহ্বান করে নেয় এই ডালপালায় বাঁধা, লতাপাতায় ঘেরা চটি। দরিদ্রা দুঃখিনী মাতা যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে পথক্লান্ত সন্তানের আশায় চেয়ে থাকেন—এক হাতে তাঁর ঝরনার সুশীতল জল, অন্য হাতে যৎসামান্য বিদুরের খুদ্।

ভোজন ও নিদ্রার পরে বেলা তিনটে নাগাৎ আবার পথে নেমে এলাম। রৌদ্র তখনো প্রচণ্ড, মেঘের চিহ্ন কোথাও নেই। দিন তিনেক আগে যে আমরা বরফের গর্ভে ঠাণ্ডায় সমাধিস্থ হতে চলেছিলাম আজ ঘর্মাক্ত কলেবরে যেতে যেতে সে কথা ভুলেই গেচি। এবেলার পথটিতে শীতকাল, ওবেলার পথে

নেমেচে চারিদিক আবৃত করে বর্ষাঋতু। গ্রীষ্মের পরই হয়ত এক সময় দেখা দিল সুন্দর বসন্তকাল। দুপুরবেলায় শীতে হয়ত সর্বশরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপচে, রাত্রে হয়ত বা গ্রীষ্মাধিক্যে অনাবৃত দেহে চটির দরজার কাছে ঘুমিয়ে রইলাম। একটি দিনের মধ্যেই কখনো পাই শরৎকালের নীলোজ্জ্বল আকাশ, মল্লিকা ও শেফালির সমারোহ; কখনো পাই শ্রাবণের মতো সকরুণ জলধারা,—কদম্ব-চম্পকের শোভা; কখনো পাই ঋতু-রাজের বসন্তবিলাস,—পূর্ণিমার মধুযামিনী; কখনো বা পাই শীতের শীর্ণতা;—প্রকৃতির রুক্ষ বৈধব্য-বেশ। প্রতিদিন আমাদের চোখে বৈচিত্র্যময় ঋতু-উৎসব। উৎপীড়িত আমরা জীবন-বৈরাগীর দল অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাদের দেখে দেখে উদাসীন হয়ে চলে যাই। আমরা আর কিছুতেই যেন মোহগ্রস্ত হইনে।

আগের দিন মন্দাকিনী পার হয়ে উখীমঠের পথে সেই যে চড়াই শুরু হয়েছিল, সে-চড়াই আজ এখনো চল্‌চে, এর আর শেষ নেই, বিরাম নেই। আজ সকালে রুইদাস সুক্কুল ও পণ্ডিতজীকে অকর্মণ্য হয়ে পিছনের চটিতে পড়ে থাকতে দেখে এসেচি। সেই বৃদ্ধা ও স্থূলকায়া মারহাট্টী স্ত্রীলোকটিকেও পথে বসে আর্তনাদ করতে দেখেচি। মনসাতলার মাসি চড়া দামে একটা কাণ্ডি ভাড়া করে কুলীর পিঠে উঠেছে। মাছির কামড়ের ঘায়ে ও পোকার তাড়নায় একেই ত সবাই যন্ত্রণাজর্জর, তারপরে এই চড়াই, জীবনের আশা আর কেউ তারা করে না। নির্মলা

চল্‌তে চল্‌তে একবার করে দাঁড়ায়, বোধ হয় কাঁদবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না. জিহ্বার সঙ্গে টাগ্‌রা স্পর্শ করতে না পেরে কেমন একরকম ভঙ্গীতে মুখের শব্দ করে, অনেকটা মৃত্যু-পথযাত্রীর খাবি খাওয়ার মতো। চল্‌তে চল্‌তে কেউ হয়ত যন্ত্র-চালিতের মতো তার মুখে একটু জল দিয়ে যায়, সে তখন ঢোক গিল্‌তে চেষ্টা করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরুপায় হয়ে তাকায়। মুখে কথা এদের কারো নেই, দাঁতের সঙ্গে জিহ্বা তালু জুড়ে এঁটে গেচে, বাক্যব্যয়ের শক্তি নেই। থামবার জায়গা এ নয়, এ সমস্তই যে অতিক্রম করে যেতে হবে, না গেলেই চল্‌বে না, পিছনে হিমালয়ের অনন্ত পর্বতমালার গর্ভে আমরা হারিয়ে গেচি, থামলেই যে চিরদিনের মতো থামতে হবে, অগ্রগতি ছাড়া আর আমাদের গতি নেই। এ পথে ক্ষমাও যেমন নেই, সুবিধারও তেমনি অভাব। পদব্রজে যে চলেচে তার অবস্থা যতই সচ্ছল হোক, বিশেষ সুযোগ পাবার কোন উপায় তার নেই। এইটি সকলের চেয়ে বড় পরীক্ষা। ছোট-বড়র প্রশ্ন এখানে ওঠবার এতটুকু অবকাশ নেই, দরিদ্র ও ধনীর বিভিন্ন হয়ে চলবার কোন পথ নেই। জাতিবর্ণনির্বিশেষে আমরা সবাই সমান। আহার-বিহার, বিশ্রাম-শয়ন ও পরিশ্রম—সকলেরই এক ধরনের। একজন যে কোথাও আর একজনের চেয়ে ভালো খেয়েচে, ভালো থেকেচে, এমন কথা যদি কেউ বলে তবে সে মিথ্যাবাদী।

পৌথীবাসা ও বানিয়া কুণ্ড ছেড়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা

চোপতা এসে পৌঁছলাম। সম্মুখে একটি বড় ধর্মশালা, তারই প্রায় কোল ঘেঁষে খানিকটা খোলা জায়গা এতক্ষণে দেখতে পেয়ে আমরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সমতল স্থানের কাঙাল হয়ে উঠেচি, যেদিকেই তাকাতে যাই পাহাড়ে পাহাড়ে দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, কোথাও আমাদের মুক্তি নেই। কেবলই মনে হয়েচে কোথাও ছুটে পালাই, কোনো উন্মুক্ত সমতল প্রান্তরে, কোনো দূর সমুদ্রের তীরে। কোথায় আঁকা-বাঁকা বনপথ, গ্রাম থেকে বেরিয়ে যে-পথ গেচে ধানক্ষেতে, সেখান থেকে নদীর কিনারায়, গ্রাম-বধূর দল যে-পথ দিয়ে কলস নিয়ে ফেরে, বাউল যে-পথে গান গেয়ে যায়—'মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ।' সে-পথ কোথায় ? আমরা এ হিমালয় আর চাইনে, পাথরের পর পাথরের পুঁজি আর চাইনে, আর চাইনে পার্বতী নীল নদী, উন্মাদিনী অন্ধ ঝরনা।

ধর্মশালার রক্ষী একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ। শীতের হাওয়ায় আমাদের জর্জরিত ও আড়ষ্ট দেখে তিনি কয়েকখানা কম্বল কোথা থেকে আনিয়ে দিলেন। বিনয়ী ও সদালাপী পা-জামা-পরা মানুষটি। যাত্রীদের কাছে সামান্য দু'চারটি পয়সা যা পান্ তাইতেই তাঁর চলে। দুধ ও তামাক খেয়ে গোপালদা একটু সুস্থ হয়ে বসলে তিনি কিয়ৎক্ষণ ধর্মালোচনা করে ও কিছু প্রণামী নিয়ে চলে গেলেন। সমস্ত দিন গ্রীষ্মের পর অকস্মাৎ সন্ধ্যায় এই হিমাচ্ছন্ন বাতাস পেয়ে সবাই কতকটা সজীব ও উৎসাহিত হয়ে

উঠলাম। গোপালদা প্রতি পনেরো মিনিটে একবার করে ছিলিম ধরাতে লাগলেন! বন্ধ ধর্মশালার বাইরে বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হতে লাগলো,—তুহিন-শীতল নিভৃত রাত্রি।

পরদিন ভোরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা ভুলোকনা চটির ধারে এলাম। আকাশে মেঘ করেচে, মাঝে মাঝে এক এক ফোঁটা বৃষ্টির জল আমাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্চে। কখনো কখনো বিদীর্ণ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ হেসে উঠেচে। পথে আজ হয়ত ঘোরালো হয়ে বৃষ্টি নামবে। ভুলোকনা পার হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাওয়া গেল বাঁ-হাতি শ্রীতুঙ্গনাথের পথ। দক্ষিণের পথ সোজা উঠে গেচে লাল-সাঙ্গা অথবা চামোলির দিকে। পথের ধারে জনকয়েক কাণ্ডি-ওয়ালাকে দেখা গেল। তুঙ্গনাথের পথ ভয়ানক চড়াই, অনেকটা ত্রিযুগীনারায়ণের মতো, যদি কেউ উঠে গিয়ে দর্শন করে আসতে চায় তবে সে এখানে খুচ্‌রো কাণ্ডি ভাড়া করতে পারে। অনেকেই গেল, কেউ গেল পদব্রজে, কেউ বা কাণ্ডিতে। হিমালয়ে সবসুদ্ধ চার ধাম। বদরীনাথ, কেদারনাথ, ত্রিযুগীনাথ ও তুঙ্গনাথ। তুঙ্গনাথ থেকে চব্বিশ মাইল উত্তরে মান্ধাতার ক্ষেত্র আছে। যাত্রীরা এখানে আকাশ-গঙ্গায় স্নান করেন। পুরাতন মন্দিরটিতে একটিমাত্র পূজারী, অতিরিক্ত নীরব ও জনবিরল পর্বতচূড়া, আশপাশে কোথাও গ্রাম বা চটির চিহ্নমাত্র নেই,

সামান্য একখানি মাত্র দোকান এক পাশে টিম্ টিম্ করচে। তুঙ্গনাথের উপরে দাঁড়ালে দূর উত্তরে ধবল তুষারময় হিমালয়ের নয়নাভিরাম রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। এমন অপরূপ রূপের বৈচিত্র্য তুঙ্গনাথ ছাড়া আর কোনো জায়গা থেকেই এমন করে দেখা যায় না। যেন মহাযোগী কেদার ও বদরীনাথের শ্বেতপুষ্পশয্যা, পদতলে এই একাত্ম হরিহরের সেবায় বসে রয়েচেন শ্যামল-শোভাময়ী মহাসতী।

দক্ষিণের পথ তুঙ্গনাথের কটিদেশ বেষ্টন করে পূর্বদিক থেকে ঘুরে পশ্চিম দিকে চলে গেচে; তুঙ্গনাথ দর্শন করে এই পথে নেমে আসতে হয়। পথ এখানে অরণ্যময় ও নিস্তব্ধ, সামান্য চড়াই ও সামান্য উৎরাই, সমুদ্র তরঙ্গের মতো আমরা কখনো উঠচি, কখনো বা নামচি, অনেকটা সমতল বলা যেতে পারে। পথটি ধরে যতই এগোই, অরণ্য ততই নিবিড় ও অন্ধকার হয়ে আসে। এখন এখানে বসন্তকাল, শুক্নো ঝরা পাতায় পথ আচ্ছন্ন। একা একাই বনপথ দিয়ে চলেচি, উৎরাইটুকু পেয়ে হাঁপ ছেড়েচি বটে, কিন্তু পায়ের সেই ব্যথাটা আবার খচ্ খচ্ করে উঠেচে! শরীরে কোথাও একস্থানে ব্যথাটি যেন থাবা পেতে লুকিয়ে বসে থাকে, সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করে। পত্রপল্লবের ভিতর দিয়ে সরসর শব্দে বসন্ত-বাতাস থেকে থেকে বয়ে চলেচে। এবারে বামে ও দক্ষিণে আবার বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি ছুটে গেল। আকাশের দিগ্‌বলয় যখন সুবিস্তৃত হয়ে ওঠে তখনই

বুঝতে হবে আমরা অনেক উঁচুতে উঠেচি। সকল দিকের দৃষ্টির বাধা যেন খুলে গেচে।

পাঙ্গরবাসা চটিতে এসে উঠলাম। সূর্যের উত্তাপ এবেলায় অল্প, আকাশ আজ সকাল থেকেই মেঘ-মলিন। উপরে ও নীচে অরণ্যময় পর্বত, সেই অরণ্যের গভীর গহ্বর থেকে ছোট-ছোট এক-একটি ঝরনা এখানে-ওখানে নেমে এসেচে। কাছাকাছি কোথাও ঝরনা থাকলেই আমরা টের পাই। এবেলায় গিরগিটির ডাক অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেচে। শীত তেমন আর নেই, প্রভাতের শীত মধ্যাহ্নে বসন্তে রূপান্তরিত হয়েচে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম সর্বাঙ্গে মাছির দল বিড়বিড় করচে, মৌচাকের গায়ে যেমন লেগে থাকে মধুমক্ষিকা। ফুঁ দিলে মাছি নড়তে চায় না, হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে হয়। মাঝে মাঝে কোনো-কোনো চটিতে লক্ষ লক্ষ মাছির এমন একটা গভীর গুঞ্জন ওঠে যে কান পেতে শুন্‌তে ভালোই লাগে। একটি মধুর একঘেয়ে উদাসীন সুর।

ভোজন ও শয়নের পর আবার ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে নামা। জুতোটা একটু ছিঁড়ে গেচে, রাঁধতে রাঁধতে হাত দু'-খানা আঁচ লেগে কালো হয়ে উঠেচে, হাতে আর লোম নেই, বাসন মেজে মেজে আঙুলগুলো বিবর্ণ ও কদাকার। আহারে কৃচ্ছ্রসাধনা করে শরীর হয়ে এসেচে রক্তহীন!—যখন বসি তখন আর উঠতে পারিনে, যখন হাঁটি তখন আর বসতে পারিনে।

পথে নেমে যন্ত্রের মতো চলি, পথ পেলেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পা দু'খানা আপনি চলতে থাকে। নিজেদের দিকে তাকিয়ে আমরা অশ্রুভারাতুর নিশ্বাস ফেলি, ঘুমের ঘোরে মুখের ভিতর থেকে এক রকম আর্তস্বর বেরুতে থাকে, তার শব্দে নিজেরাই চমকে উঠি, তখন বুঝতে পারি মানুষের নিপীড়িত আত্মা কী কষ্টে মানুষের মধ্যে কেঁদে বেড়ায়।

উপর থেকে নীচে অরণ্যের ভিতরে নেমে চলেচি। এখনো সন্ধ্যার অনেক বিলম্ব, তবু ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসচে। শোনা গেল, এ অঞ্চলে হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে, সাপ এখানে পায়ের শব্দে পালায় না, মানুষ দেখলে ঘাড় উঁচু করে তাকায়, গাছ-পালায় তারা ভ্রমণ করে, পথের ধারে ধারে হাঁটে। কবে নাকি এ-অঞ্চলে দাবানল জ্বলে উঠেছিল, তারই পোড়া দাগ গাছে গাছে এখনো লেগে রয়েছে। সন্ত্রস্ত ভয়ে আমরা সদলবলে চলেচি। কেউ যদি এগিয়ে যায় তবে দু'পাশে জঙ্গলের চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়, অকারণ গোলমালে পথটা সরগরম করে তোলে,—পিছিয়ে পড়তে কেউ চায় না। কোথাও কোথাও পথ পিছল, শ্যাওলা, চড়া, কোথাও কোথাও পথের উপর দিয়েই কোনো কোনো ঝরনার আবিল স্রোত বয়ে চলেচে। আকাশ দেখতে দেখতে ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হয়ে এলো, মেঘ ডেকে উঠলো, বিদ্যুৎ খেলতে লাগলো—বজ্রপাতের শব্দে এদিকে পাথরে ফাটল ধরে, পাথরখণ্ড

স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে নেমে আসে, সে এক ভয়াবহ বিভীষিকা। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘন হয়ে এলো, সপ্ সপ্ করে বৃষ্টি নামলো। তখন আর উপায় নেই, বর্ষণ শেষ হবার অপেক্ষায় কোথাও দাঁড়ানো যায় না, এ গভীর অরণ্যে একটি মুহূর্তও কোথাও আশ্রয় নেওয়া চলে না। বৃষ্টিতে ভিজি ক্ষতি নেই, কিন্তু এই অরণ্যের কবল থেকে পালাতে পারলে আজকের মতো বেঁচে যাই। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এক-একবার বৃক্ষলতার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেচি, গা ছম্‌ছম্ করচে, শরীর ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচে। আঁকাবাঁকা পথ, একজন মোড় ঘুরলেই অন্য জনকে আর দেখা যায় না, সবাই কাছাকাছি আছি বটে কিন্তু প্রত্যেকেই হারিয়ে গেচি। এতক্ষণ কথাবার্তা বলছিলাম কিন্তু পথের ঠিক পাশেই কি-একটা জানোয়ারের একখানা শুক্‌নো কঙ্কাল দেখে অবধি আর আমাদের মুখে কথা নেই। কখনো কখনো অন্ধকারে পাখীর ডানার ঝটাপট শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি, এবার হয়ত সত্যিই সন্ধ্যা হয়েচে। বায়ু ও বৃষ্টি বেগে আমরা সেই অন্ধকারে প্রায় দিশাহারা হয়ে গেলাম।

চারুর-মা কুঁজো হয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বামুন-বুড়ী কুলীর পিঠে কাণ্ডিতে চলচে, তার দিকে তাকিয়ে চারুর-মা ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, 'তুমি পাচ্চ না মা ?'

বামুন-বুড়ী চুপি চুপি বললে, 'কি লা ?'

চারুর-মা চলতে চলতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলতে

কেমন যেন বোট্‌কা গন্ধ! এই কাছেই কোথাও আছে মা।'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা—ও তুলসীরাম, চলো বাবা এগিয়ে।' বলেই বামুন-বুড়ী হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, 'পঞ্চাননের কিছু করে আসতে পারলুম না...মধুসূদন, নারায়ণ!'

তুলসীরাম তাকে নিয়ে এগিয়ে যেতেই সেই কঙ্কাল-শরীর জরাজীর্ণা চারুর-মা আমার কাছাকাছি এসে একগাল হেসে বললে, 'দিলাম বামুন-মাকে ভয় খাইয়ে বা'ঠাকুর···মরবার নামে এত ভয়!'—বলতে বলতেই সেই অশীতিপর মৃত্যুভয়হীনা বৃদ্ধা গল্‌ গল্‌ করে হাসতে লাগলো।—আমি যদি মরি তবে চারু রইলো, ও আমি চুকিয়ে এসেচি···সরস্বতী, ভাদু, হাবলি, আর বাকি কটা গোরু-বাছুর···তিরিশ সের দুধ রোজ হবেই, চারুর একটা পেট, সেই এগারো বছর বয়স থেকে বিধবা···চলবে না বা'ঠাকুর?'

'চলবে বৈকি।'

কত গল্পই চারুর-মা সেই দুর্যোগময় পথে যেতে যেতেই করে গেল। তার দুধের ব্যবসার ইতিহাস, তার ভাইপোর কাহিনী, তার সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও নেপাল-পশুপতিনাথের রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিছুই কানে ঢুকছিল না, মাঝে মাঝে শুধু 'হুঁ' দিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছিলাম। চারুর-মা কোনো বিপদ বা দুঃখকে এতটুকু ভয় করে না।

যাক্‌, বৃষ্টি ধরে গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে, অনন্ত সমুদ্রে

পথহারা নাবিক যেমন অকস্মাৎ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আবিষ্কার করে বসে, তেমনি দূর্ অন্ধকারে আলোকবর্তিকা দেখে আমরা উল্লসিত হলাম। আজকের মতো মৃত্যুকে আমরা তবে এড়াতে পেরেচি! অরণ্যের পথ তখন শেষ হয়েচে। আঃ—বাঁচলাম!

অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে চটি পাওয়া গেল। নিকটে বালখিল্য নদীর শীর্ণধারা দৃষ্টিগোচর হ'লো না, শুধু নদীর রেখাটি দেখা গেল। একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে কিন্তু তা দর্শন করার আর শক্তি নেই। ধর্মশালায় জায়গার অনটন হ'লো, আমরা ডালপালায় বাঁধা চটিতেই আশ্রয় নিলাম। এর নাম মণ্ডল চটি, অনেকে জঙ্গল চটি বলেও এ'কে অভিহিত করে। আজকের মতো এখানেই যাত্রা শেষ। গোপালদা মহাসমারোহে ছিলিম্ প্রস্তুত করলেন

খানিক রাতে, আমরা যখন শয়নের আয়োজন করচি, এমন সময় দুটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ কাঁদতে কাঁদতে এসে চটির ধারে দাঁড়ালো। কী কান্না, কী আকুলি-বিকুলি, বললে, 'মহারাজজী, তুমারা গোড় লাগি, এক লণ্ঠন হাম্‌কো দেও, এক আদ্‌মি হামারা জঙ্গলমে রহে গৈ, দেও বাবা, দেও।'

এই ঘনঘটাচ্ছন্ন রাত্রে কোথায় কোন্ জঙ্গলে তাহাদের লোক পড়ে রইলো? সে কি এখনো বেঁচে আছে? জানা গেল সে স্ত্রীলোক। সঙ্গে আসতে আসতে পিছনে পড়েচে, এতক্ষণ অপেক্ষার পরেও সে এসে পৌঁছলো না। আলো হাতে নিয়ে তাকে সেই দুর্গম ও প্রাণঘাতী পথে খুঁজতে যেতে হবে, কিন্তু

হ্যারিকেন লণ্ঠন তাদের কাছে নেই। নির্মলা আর থাকতে পারলো না, দিল তার লণ্ঠনটা তাদের হাতে তুলে, তাঁরা উন্মাদের মতো সেই রাত্রে আবার সেই পথ ধরে চললো—কথা রইলো, লালসাঙ্গায় গিয়ে তারা লণ্ঠনটা ফেরত দেবে।

গতদিনকার কথা ভুলে গেচি। যত দিন যায়, স্মৃতি শিথিল হয়ে আসে। গত রাত্রের দুর্যোগ ?—সে ত স্বপ্ন, সে ত মায়া! আজকের এই সকালবেলাটিই সত্য—এই নীল আকাশ, এই নির্মল রৌদ্র,—বসন্ত-দিবসের এই অপরূপ ঐশ্বর্যসম্ভার। গত দিনের প্রকৃতির আলোড়ন, প্রলয়ান্ধকার, ঝটিকা ও বজ্রপাত —সে অতীত কালের, গত জন্মের। আমাদের সর্বশরীরে তার ছাপ আছে, কিন্তু মনে তার একটুও দাগ নেই। স্মরণ-শক্তির পরিসর আমাদের অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে, এবেলার ইতিহাস ওবেলায় হয়ে ওঠে উপন্যাস। আমারই ঘটনা অন্যের মুখ থেকে যখন শুনি, অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। আবার হাঁটচি। সকাল থেকে লেগেচে চড়াই, দেয়াল বেয়ে যাত্রীর দল উঠচে পোকার মতো। পোকার মতো অক্লান্ত, পোকার মতো নির্বাক।

সুটানা চটি ধীরে ধীরে পার হ'লাম। আর চলতে পারচিনে। শরীর অতিরিক্ত যন্ত্রণায় থর থর করে কাঁপচে। চোখ জ্বালা করচে, হাতের লাঠি আর শক্ত করে ধরে থাকা যাচ্চে না। ঝোলা ও কম্বল কাঁধের উপরে প্রবল শত্রুর মতো চেপে ধরেচে, এদের গুরুভার ও পীড়ন আর সইতে পারিনে। এমনি করে এলাম

আরো মাইল দেড়েক পথ। রৌদ্র অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেচে, এত তীব্র যে গা পুড়ে যায়। কাছেই পাওয়া গেল গোপেশ্বর, সম্মুখে গোপেশ্বরের প্রকাণ্ড প্রস্তরময় মন্দির। অতি নগণ্য একটি শহরের অনুকরণ, দু'একখানি দোকান, নিকটেই ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম, গ্রামের ছেলেমেয়েরা পাই-পয়সা ভিক্ষা করতে যাত্রীদের কাছে ছুটে এলো। শিবমন্দিরটির সম্মুখে বিরাট এক ত্রিশূল দণ্ডায়মান, তারই লৌহবক্ষে দ্বাদশ শতাব্দীর মহারাজা অনেকমল্লের বিজয়বার্তা এক দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত। যাত্রীরা এখানে বৈতরণীকুণ্ডে স্নান করে। তা করুক। একখানা দোকানের ধারে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। মাথা ঘুরচে, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করচে। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচ্‌ড়ে উঠে সেই পথের ধারেই বমি করলাম। ভগবান, এ কী হ'লো? দম নেবার আগে আর একবার বমি। লোকজন পাশ দিয়ে চলে যাচ্চে, মুখ ফিরিয়ে তাকাবার প্রয়োজন তাদের নেই, এমন অবিশ্রান্তই ঘট্‌চে।

কে একজন পার হয়ে যাচ্ছিল, বলে গেল, 'এক কাণ্ডি কর্ লেও ইয়ার,—জয় বদরীবিশাল লাল কি!'

না, না, সময় নেই, সবাই গেল এগিয়ে। ওরে শ্রান্ত, ওরে ভ্রান্ত, ওরে ভগ্ন, আর একবার উঠে দাঁড়া, কাঁধে তুলে নে ঝোলা-ঝুলি, ধর্ বাগিয়ে লাঠি ও ঘটী, অতীত শক্তি ফিরিয়ে আন্, বিদীর্ণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠ্,—

'ব্যাঘাত আসুক্ নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে বাজে
তোমার জয়ডঙ্ক ;
দেব সকল শক্তি, ল'ব
অভয় তব শঙ্খ।'

বালি-পাথরের পাহাড়, সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে নানাবর্ণে ঝলমল করে উঠচে, পাশে বনগোলাপের জঙ্গল, ডালিম আর আখরোটের বন। তারপরেই বাঁ-দিকে পথ ঘুরলো। ঘুরতেই দেখলাম বহু নীচে চামোলি শহর, লালসাঙ্গা। তারই নীচে অলকানন্দা নদীর ওপারে সাদা সূতোর মতো শীর্ণ সেই মহাপ্রস্থানের পুরাতন পথটি কর্ণপ্রয়াগ হয়ে লালসাঙ্গায় এসে মিলেচে, ওই পথটি ধরে যাত্রীরা ফিরে যায়। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর অলকানন্দার পুল পার হয়ে লালসাঙ্গার ধর্মশালায় এসে উঠলাম। বেলা তখন টা-টা করচে।

কেদার, বদরী ও কর্ণপ্রয়াগের কেন্দ্রস্থল এই চামোলি। ছোট শহর, কিন্তু সমৃদ্ধ। এখানে গাড়োয়াল জেলার একটি আদালত, বনবিভাগের দপ্তর, কালেকটারী, পুলিস, কুলী-এজেন্সী, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বাজার, সদাব্রত ও ডাকঘর প্রভৃতি শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অকর্মণ্য যাত্রীরা এখান থেকে বদরীনাথ পর্যন্ত মূল্য দিয়ে ঘোড়া গ্রহণ করতে পারে।

ধর্মশালায় গোপালদা ও বুড়ীদের দেখা পেলাম কিন্তু বাক্যালাপের রুচি হ'লো না। তিনি কেবল একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও কি, কী হ'লো দাদা তোমার ?'

কথা বলতে পারছিলাম না, কেবল কম্বলটা কোনো রকমে ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। মাটির ভিতরে যেন তলিয়ে যাচ্চি। গোপালদা সরে এলেন, গায়ে ও কপালে কিয়ৎক্ষণ ত্রস্তভাবে হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, য ভেবেচি তাই, এ তো রোদের গরম নয়, গা যে তোমার জ্বরে পুড়ে যাচ্চে ! কী হবে !'

কী হবে তা সবাই জানে, গোপালদারও অবিদিত নয়; তাঁর সস্নেহ উক্তিটি বিদ্রূপের মতো কানের ভিতর বাজলো! কিন্তু তখন উত্তর দেবার আর সামর্থ্য ছিল না, জ্বরে আমি অচেতন আর আমার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। যে প্রকাণ্ড আমাদের দল একদিন হৃষীকেশ থেকে যাত্রা করে দেবপ্রয়াগ পৌঁচেছিল, সেই দল আমাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে। কে গেচে ফিরে, কেউ থেমে গেচে, কেউ অকর্মণ্য হয়ে কোথায় পিছনে নিরুদ্দেশ হয়ে গেচে, কেউ পড়েচে মৃত্যুমুখে! আমাদের দলের তিনজন নেই, আজ আমাকেও থেমে যেতে হ'লো বাইশটি দিনে প্রায় সমস্ত পথ শেষ করেছিলাম, আর মাত্র সামান্য পথ বাকি, অতি সামান্য পথ, কেবলমাত্র আটচল্লিশ মাইল, এক ছুটে হয়ত এই আটচল্লিশ মাইল শেষ করে দিতাম

কিন্তু তা আর হ'লো না। জ্বরাক্রান্ত, পঙ্গু হয়ে এই পথের ধারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পড়ে রইলাম। গোপালদা কেবল হাসপাতালের দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

কোনোক্রমে সামান্য আহারাদি শেষ করে আমার এই পরম প্রিয় দলটি যাত্রার আয়োজন করলো। আমার সাড়া ছিল না, বাক্‌শক্তি ছিল না, তাদের বিদায় দেবার মতো উৎসাহও নেই, কেবল নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। যাবার সময় চারুর-মা দিল একটু জল, গোপালদা দিয়ে গেলেন সহানুভূতি ও শুভকামনা। বলে গেলেন, 'দুঃখ করবার কিছু নেই, সবই বাবার ইচ্ছে। ফেরবার সময় এই পথেই আসতে হবে, এসে দেখি যেন তুমি সেরে উঠেচ ভাই। জ্বর একটু কমলে কিছু খাবার চেষ্টা ক'রো।'

নির্জন ধর্মশালা, মাথার দিকে নীচে অলকানন্দার কলকল শব্দ শুনতে পাচ্চি। কাছেই কোথা থেকে একটু আধটু মানুষের গলার আওয়াজ কানে আসচে। মাথার কাছে দেখতে দেখতে অপরাহ্ণের রৌদ্র এসে পড়লো, হু হু করে বসন্তের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। সম্মুখে লাল ও শ্বেত পাথরের দুটো পাহাড় সূর্যকিরণে এক আশ্চর্য রূপ পরিগ্রহ করেচে। নদীর ওপারে যে পথটা দিয়ে আমরা এসেচি সেই পথ-রেখাটি স্বপ্নলোকের মতো দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আমার রক্তরাঙা রুগ্‌ণ ও স্তিমিত দৃষ্টি আবার বুজে এলো। সর্বশরীরে জ্বরের অসহ্য যন্ত্রণা ও জ্বালা ধরেচে, আর আমার কোনো আশা নেই। মনে মনে সকলের

নিকট সজ্ঞানে বিদায় নিলাম। জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানালাম।

কতক্ষণ পড়ে ছিলাম মনে নেই। এক সময় উঠে পাগলের মতো ছুটে ধর্মশালার পিছন দিকের পথে নেমে এলাম। তখন অপরাহ্ণ চলেচে সন্ধ্যার দিকে, বেলা আর বাকি নেই। বালি ও পাথরের দুস্তর পথ দিয়ে সোজা নেমে নদীর তীরে এলাম। দু'চার জন সাধু-সন্ন্যাসী এখানে-ওখানে জটলা করে বসে রয়েচে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে সবসুদ্ধ জলের মধ্যে নামলাম, স্রোত অত্যন্ত প্রবল, কিছুদূর জলের মধ্যে গিয়ে একখানা বড় পাথর আঁকড়ে ধ'রে ডুব দিলাম!

প্রায় আধঘণ্টা বেপরোয়া স্নান করে যখন ধর্মশালায় এসে উঠলাম তখন শরীর একটু সুস্থ হয়েচে। বিষে বিষক্ষয় হ'লো। কোনোদিকে আর না তাকিয়ে ঝোলাঝুলি আর লাঠি নিয়ে একাকী পথে এলাম। সন্ধ্যা তখন সমাগত। তা হোক, খানিকটা পথ এখনো হাঁটা যাবে। আমি সেদিন মরীয়া।

কেমন করে কয়েকটা চটি পার হয়েছিলাম আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। রাত্রে এক জায়গায় আশ্রয় নিলাম। পরদিন প্রভাতে পার হ'লাম পিপলকুঠি। পথের ধারে কয়েকটি রক্তকরবীর গাছ পাওয়া গেল। লাল ফুলের সমারোহের উপরে এসে পড়েচে নবীন সূর্যের কিরণচ্ছটা। এখানে বাঘভালুকের চামড়া খুব সস্তা দরে বিক্রি হয়। পিপলকুঠিতে গাড়োয়ালী

মেয়েরা কম্বলের ব্যবসা করতে আসে। মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছুলাম গরুড়গঙ্গার চটিতে। এখানে গরুড়গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। গরুড়মন্দির ও সামান্য শহর পাওয়া গেল। প্রকাশ, ফেরবার পথে গরুড়গঙ্গায় এক ডুবে একটি পাথরের নুড়ি তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পূজো করলে সাপের ভয় থাকে না। গরুড়গঙ্গা থেকে পাতালগঙ্গা চার মাইল চড়াই পথ। পথটি চিড় ও পাইনের জঙ্গলে সমাকীর্ণ, ছায়াবীথির মতো। সন্ধ্যার সময় পাতালগঙ্গার চটিতে এসে আশ্রয় নেওয়া গেল। পাশেই গণেশের মন্দির, পাতালগঙ্গা গিয়ে মিশেচে অলকানন্দায়।

পরদিন সকাল থেকেই পথ হাঁটতে শুরু। সঙ্গে সঙ্গে জন-কয়েক অপরিচিত যাত্রী চলেচে। গোলাপকুঠি পার হয়ে মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছলাম কুমারচটিতে। সমতল পথ, প্রাকৃতিক শোভায় চটিটি সমৃদ্ধ। নিকটে কর্মনাশা নদী। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, কোথাও অকারণে বেশিক্ষণ থাকতে আর ভালো লাগচে না। বরং পথে পথে বসে বিশ্রাম নেওয়া যাবে, পথেই আমাদের যা-কিছু।

ঝড়কুলা ও সিংহদ্বার পার হয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যেখানে এসে পৌঁছলাম সে আমার আবাল্যের স্বপ্ন যোশীমঠ। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়চে। আবার বেশ শীত লেগেচে। যোশীমঠ নামে এই ক্ষুদ্র শহরটির খ্যাতি, এর সংস্কৃত নাম জ্যোতির্মঠ। এখান

থেকেই শঙ্করাচার্যের উত্তরধাম শুরু হ'লো। বদরীনাথের পূজারী রাওল মহাশয়ের এখানে বাসা, শীতকালে এখান থেকেই তিনি বদরীনাথের পূজা করেন। নৃসিংহদেব-প্রমুখ অনেকগুলি দেবতার মন্দির এখানে রয়েচে, সবগুলি মন্দিরই একটি চত্বরের চারিপাশে অবস্থিত। এখানে নভোগঙ্গায় স্নান অপেক্ষা দণ্ডধারায় স্নান প্রশস্ত। আসলে দুটিই অব্যবহার্য,—তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। যোশীমঠ ক্ষুদ্র শহর বটে কিন্তু উখীমঠের চেয়ে বড়। বাজার, ডাকঘর, ছাপাখানা, সদাব্রত, বসতবাটী—কী নেই? কাছেই তিব্বত ও মানস-সরোবর যাবার পথ। অনেকেই এখান দিয়ে যান কৈলাস ও মানস-সরোবর। মাইল তিনেক গেলেই ভবিষ্যবদরী দর্শন হয়। ধর্মশালায় উঠে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই শীতের কাঁপুনি ধরলো, নিকটে পাহাড়ের চূড়ায় একটু একটু সাদা তুষার দেখা গেল। তুষার সম্বন্ধে একটা ভীতি জ'ন্মে গেচে। যোশীমঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

রাত্রিশেষে শীতার্ত দেহে একাকী যোশীমঠের নিকট বিদায় নিয়ে উৎরাই পথে নামতে লাগলাম। তিন মাইল পথ নামতে হয়, পায়ের ব্যথাটা জেগে উঠলো। তিন মাইল পথ এসে নদীর পুল পার হয়ে যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছলাম তখন সকাল হয়েচে। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা বা অলকানন্দা ও ধবলীগঙ্গার সঙ্গম। পুরাকালে বিষ্ণু-আরাধনা করে নারদমুনি এখানে সর্বজ্ঞ হবার বর লাভ করেছিলেন। নীলবসনা অলকানন্দার কোলে

গৈরিকবসনা গঙ্গার আত্মসমর্পণ এস্থলে এক রোমাঞ্চকর নয়নাভিরাম দৃশ্য। এখান থেকে বদরীনাথ আর মাত্র ষোলো সতেরো মাইল পথ।

ধবলীগঙ্গার তীরে তীরে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বিপজ্জনক পথ। খানিকটা সমতল, খানিকটা বা চড়াই। খাড়া দেওয়ালের মতো চড়াই নয়, ধীরে ধীরে উঠচে। কোথাও পথ সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়ে নদীর মধ্যে অদৃশ্য হয়েচে। কোথাও পড়েচে পাথর, তাকে অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোথাও পথ নেই, ঝরনার জলের উপর দিয়েই চলতে হচ্চে। কোথাও স্তূপাকার বালি ও নুড়ি, অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলে এগোতে হয়। কাল থেকে মার্বেল পাথরের পাহাড় দেখতে পাচ্চি, কোনোটা হাঁসের পালকের মতো সাদা, কোনোটা গোলাপী, কোনোটায় নীল ও হরিদ্রার সমাবেশ। দুই দিকে শ্বেত পাথর, মাঝখানে কুলুকুলু গঙ্গার প্রবাহ। অল্প অল্প চড়াই পথ ধরে কেবলই আমরা উপর দিকে উঠে চলেচি, আজকের চড়াইতে বুকে ব্যথা ধরচে না বটে কিন্তু ক্লান্তি আসচে—পা কন্‌কন্‌ করচে। জ্বর ছেড়ে গেচে, কিন্তু শরীর সুস্থ হয়নি। অর্ধাশন ও উপবাসে দেহ বেতসলতার মতো দুলচে। ঘাটচটি পার হয়ে দু'মাইল চড়াই উঠে অনেক বেলায় অবসন্ন শরীরে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে এসে পৌঁছিলাম।

গ্রামখানি মন্দ নয়, নদীর উপরেই। পাথরের খাদরি করা গ্রামের উঁচুনীচু পথ, ডালপালা ও গাছের গুঁড়ির তৈরি অনেক-

গুলি চটি, ক্ষুদ্র একটি ধর্মশালা, নিকটে যোগবদরী মন্দির একটি ঔষধালয় পাওয়া গেল, সেখানে মুষ্টিযোগ ও টোট্কা তুক্তাকের কারবার। সম্মুখের পর্বতচূড়ায় পাণ্ডুরাজা বাস করতেন, মন্দিরে তাম্রশাসন-পত্র আছে। স্থানীয় লোকেরা বোঝাতে চাইলো, এই পথ দিয়ে একদিন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছিলেন, কতকগুলি প্রমাণোপযোগী চিহ্ন পর্যন্ত তারা দেখিয়ে দিল। আমরা স্বর্গদ্বার অবধি যাবো কিনা অনেকে প্রশ্ন করলো। শীতপ্রধান মুলুক, তাই এদিকের সাধারণ অধিবাসীরা সুশ্রী ও সুন্দর। আজকের পথের আশেপাশে বহু ভূর্জপত্রের গাছ, মাঝে মাঝে কোনো কোনো চটির চালাগুলি মোটা-মোটা ভূর্জপত্রের তৈরি। কোথাও কোথাও রক্তরাঙা জবাফুলের মতো পাহাড়, কোনো পাহাড় উজ্জ্বল কালো রঙের, কোনোটা নীলাভ্রের মতো, আবার কোনো পাহাড় দুগ্ধশুভ্র,— নির্বাক বিস্ময়ে দেখে দেখে চলে যাই। আহারাদির পর আবার পথ ধরেচি। বর্ষণোন্মুখ মেঘ মাঝে মাঝে সূর্যালোককে আবৃত করে ভেসে চলেচে, নদীর তীর ধরে হাঁটচি। গঙ্গার ধারা আর নীল নয়, কোমল মৃত্তিকাবর্ণের। নদী এখন আমাদের দক্ষিণে। পথের নির্দেশে একই নদী বহুবার এপার-ওপার হতে হয়। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ঋজু-কুটিল অনন্ত উপলখণ্ডময় গঙ্গা সগর্জনে ছুটে আসচেন। পথ থেকে নেমে পাথরের জটলা পার হয়ে নদীর জল স্পর্শ করা অসাধ্য ব্যাপার, সে সম্ভব নয়।

আবার নদীর সমতল ছেড়ে পথ উপর দিকে উঠচে, অল্প অল্প ঘিনঘিনে চড়াই, পায়ের হাঁটু কন্‌কন্ করে। কখনো কখনো দু'চারজন বদরীপ্রত্যাগত প্রসন্নমুখ যাত্রীর দেখা মিলচে। সকলের মুখেই খুশী, আনন্দ ও বদরীনাথকীর্তন। কাঙালের মতো তাদের দিকে মুখ তুলে আবার এগিয়ে যাই।

লামবগড় চটি পার হ'লাম। পথ আস্তে আস্তে উপরে উঠচে, কেবলই উঠচে। এবার নদীও উঠে এসেচে, মুখর তার প্রবাহ, ভীমগর্জনে নীচের দিকে ছুটচে। পাথরের সঙ্গে নদীর খেলা দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। কতবার যেতে যেতে থামি, চোখ ভরে দেখে দেখে মনে ছবি এঁকে রাখি, নিশ্বাস ফেলে আবার চলতে থাকি। নদীর অবিশ্রান্ত গতির দিকে তাকিয়ে মানুষের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে কেন তা বলতে পারিনে, কিন্তু দুরন্ত জলস্রোত শিরার রক্তে যে দোলা দিয়ে যায় তা জানি। এক জায়গায় এসে থামতে হ'লো, এমন সঙ্কীর্ণ ও গড়ানে পথ যে, বসে-বসে নামা ছাড়া উপায় নেই। বসে বসেই নীচের দিকে লাঠি গেঁথে নদীর ধারে নেমে এলাম। এপার থেকে ওপারে যেতে হবে, মাঝখানে দড়ির পুল। এই দড়ির পুল অত্যন্ত স্বদেশী, আদি ও অকৃত্রিম। এপারের পাহাড়ের সঙ্গে ওপারের পাহাড়ের পাথরে বাঁধা মোটা দু'জোড়া কাছি, সেই কাছির সঙ্গে বাঁধা কয়খানা তক্তা, তার উপর দিয়ে ভয়ার্ত মহা-প্রাণী হাতে নিয়ে পার হয়ে যেতে হবে। উপায় নেই, মরেচি

না মরতে আছি, চোখ বুজে কম্পিত কলেবরে ভয়ে ও সাবধানে পুলটা পার হয়ে গেলাম। পার হয়ে যে পথটি স্পর্শ করলাম তার চেহারা দেখেই তো চক্ষুস্থির। একখানা খাড়া মনুমেণ্ট, অথচ ওঠবার সিঁড়ি নেই। আর কত বাধা ও বিঘ্ন সৃষ্টি করাবে বাবা বদরীনাথ ?

হনুমান চটিতে পৌঁছে সেদিনের মতো যাত্রা শেষ করলাম। প্রচণ্ড শীতের হাওয়ায় সর্বশরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপচে, আবার বরফের তীরে এসে পৌঁছেচি। আকাশ মেঘলা, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়চে, চারিদিক অন্ধকার করে এসেচে। কাল সকালে বদরীনাথে গিয়ে পৌঁছবো, যাত্রা শেষ হবে। পাশেই হনুমানজির প্রাচীন মন্দির, কিন্তু ভিতরে ঢুকে দর্শন করবার আর সামর্থ্য নেই। বাঁ-হাতি পাকা ধর্মশালাটার দোতলায় এসে উঠলাম। ভিতরে-বাইরে তখন বহু যাত্রীর সমাগম হয়েচে।

'ওমা, বা'ঠাউর যে! এলে ?'

ফিরে দেখি, চারুর-মা। বললাম, 'এই যে, ভালো ত সব ? গোপালদা কই ?'

ভিতর থেকে শীতার্ত কণ্ঠে সানন্দ উত্তর এলো, 'এসো দাদা-ভাই, তামাক ধরাচ্চি। সমস্ত পথটা তোমার কথা ভাবতে ভাবতে....ভাগ্যি এ বেলায় বেরিয়ে পড়িনি !"

আর সবাই বললে, 'তুমি বাবা সন্নিসি নও, সন্নিসি হ'লে

নুষের ওপর এত টান্ হ'তো না!'

'তথাস্তু।' বলে গোপালদার পাশে গিয়ে কম্বল বিছোলাম। য়ানক ঠাণ্ডায় তখন হাত-পা জড়িয়ে যাচ্চে। চারিদিকে তজর্জর সন্ধ্যা নেমে এসেচে।

*　　*
*

"যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রীদল",
উঠেছে আদেশ,
"বন্দরের কাল হ'লো শেষ।"

প্রত্যূষের তরল অন্ধকারে কাঁপতে কাঁপতে সবাই নামলো থে। মেঘে-মেঘে দিগ্‌দিগন্ত ঘনতমসাবৃত, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি াবুকের মতো সপাসপ গায়ে এসে আঘাত করচে। বাঁ-দিকে দীর ভাঙন ঘুরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পথ উত্তর দিকে চলে গেচে। িমকণাযুক্ত তীক্ষ্ণ বাতাসে বুকের রক্ত পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে, াতের সঙ্গে দাঁত ঘষে একরকম শব্দ হচ্চে। আবার সেই কদারনাথের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন-বালিকার তো লতা-পুষ্পালঙ্কার-শোভিত ঝরনাগুলি যাত্রীদের সাদর অভিনন্দন জানাতে পথের উপরেই নেমে এসেচে। কোথাও অরণ্যের আর দেখা মিলচে না, এদিকে তাদের আর আশ্রয় নেই, এদিকে তুষারের দেশ,—কোথাও কোথাও দরিদ্রবেশধারী য়েকটি গাছপালা স্বদেশী নেতার মতো জটলা করে তুষারের

অত্যাচার সম্বন্ধে ভীরু প্রতিবাদ জানাচ্চে। তাদের উপর দি
চলচে দুর্যোগের ঝটিকা। নদীর প্রবাহ কোথাও লুপ্ত হয়েচে
উপরে আস্তৃত হয়েচে জমাট বরফের শয্যা। দুই তীরের কৃষ্ণকা
পর্বতের গা বেয়ে সাদা তুষারের ধারা নেমে এসেচে, যেন ঘনশ্যা
বনমালীর গলায় দুলচে মল্লিকার মালা।

কয়েকজন মাত্র সারবন্দী হয়ে চলেচি। পথ আজ অত্য
সঙ্কটাপন্ন, কোথাও কোথাও বালুময় কিনারা, পথ নদীর মধ্যে
ধ্বসে গেচে,—অগাধ নীচে নদী। ভয়ে পা কাঁপচে। কোথা
কয়েক ইঞ্চি মাত্র কিনারা, কাত হয়ে পাহাড়ের গায়ে পিঠ ঘেঁষে
চোখ বুজে পার হচ্চি, কেউ পিছন থেকে এক-একবার প্রাণভয়ে
আর্তনাদ করে উঠচে, একটিবার মাত্র পা ফস্‌কে গেলেই—ব্যাস
আর টাল্‌ সামলানো যাবে না, তুষারময় নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে
যেতে হবে।

কিছুক্ষণ এমনি করে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে আবার একটু ভালো
জায়গায় এসে পৌঁছলাম। কাছেই যৎসামান্য একটি পাহাড়ী
বসতি। মেয়েরা পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে বদরীনাথের দিকে
রওনা হচ্চে। কেদারের মতো বদরীনাথেও জ্বালানি কাঠ মেলে
না, দক্ষিণের বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে স্ত্রী-পুরুষে পিঠে বেঁধে
নিয়ে যায়, এক আনায় মোট এক আঁটি বিক্রী করে। তাদের
গতিবিধির দিকে তাকিয়ে মন হ'লো পথ ফুরিয়ে এসেচে।

তারপর ?

তারপর স্বপ্ন দেখচি। অর্ধনিদ্রার আবেশে জেগে উঠলো কটি রূপলোক, মায়াময় বিচিত্র অমরাবতী,—সম্মুখে দূরে একটি পুল-বিস্তৃত তুষারময় প্রান্তর, তারই একান্তে কুয়াশায় ঢাকা কখানি গ্রামের অস্পষ্ট চিত্র, মধ্যস্থলে মন্দিরের একটি স্বর্ণচূড়া, দ-প্রান্তে স্রোতস্বিনী জহ্নুবালা !

নিশ্চয়, নিশ্চয় বেঁচে আছি। বুকে এখনো আছে প্রাণচিহ্ন, খনো শিরায় আছে শেষ রক্তবিন্দু, চক্ষু এখনো নিঃশেষে অন্ধ য়নি ; এই পক্ষাঘাতগ্রস্থ হাত, এই পীড়ন-জর্জর চরণ, এই শুষ্ক রস দেহ, এই ভগ্ন অবসন্ন হৃদয়—এ আমার, এ আমিই !

"দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা"

জয় বদরী-বিশাল-কি জয় !

২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯।

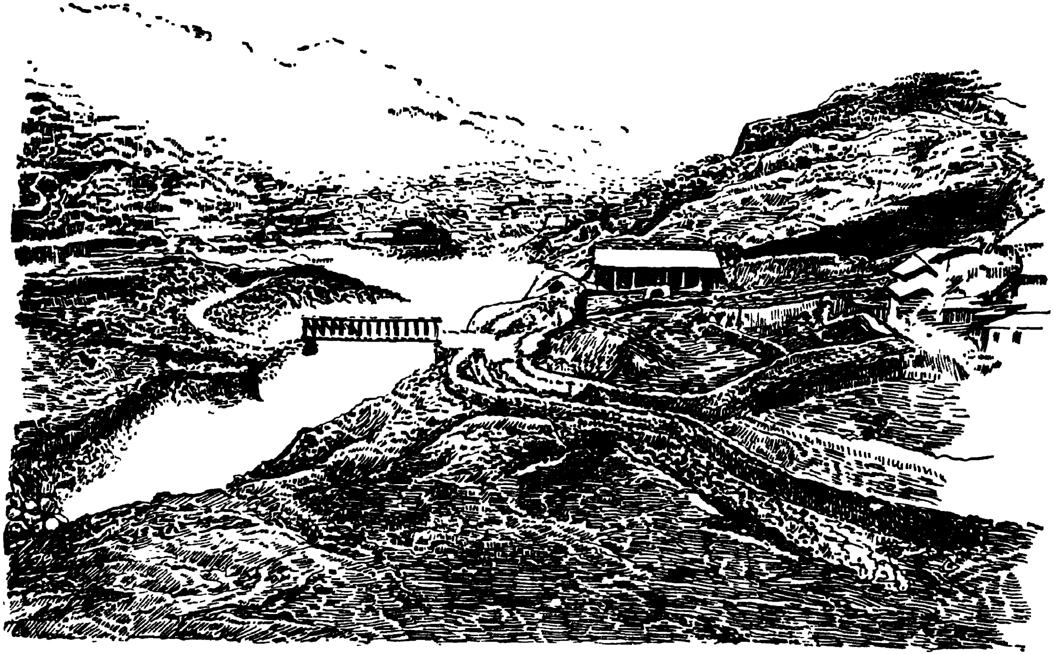
মহাকালের জপের মালায় আজকের দিনটি নেই, আজকের ই হিমকণাময় কুয়াশাভরা প্রভাতটি আমাদের পরমায়ু থেকে চ্ছিন্ন, মৃত্যুর অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে আমরা একটি নূতন লাকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেচি। তাই প্রথমেই মনে হ'লো আমরা ঝি বেঁচে নেই, এ বুঝি বা একটা নির্দয় প্রলোভন, অমর্ত্য রীচিকা।

দূর থেকে বদরীনাথের ক্ষুদ্র গ্রামখানি যখন প্রথম দৃষ্টিগোচর

হ'লো তখন এই কথাটিই ভেবে নির্বাক হয়েছিলাম। আনন্দ উল্লাস করবার শারীরিক এবং মানসিক সঙ্গতি নেই। করেই বা থাকবে? আমরা ফুরিয়ে ফতুর হয়ে গেচি, নিঃশেষি তৈলপ্রদীপের মতো। দীর্ঘ পঁচিশ দিনের যে দুঃখময় ইতিহ আমাদের পিছনে পড়ে রইলো, তাকে আমরা ভুলেই গে আজ আমাদের যাত্রার শেষ, দুঃখ-দহনের নিবৃত্তি। যে পদচিহ্ন ময় পথ একদিন গ্রামের সীমা অতিক্রম করেছিল, পার হয়েছি নদী ও অরণ্য, উত্তীর্ণ হয়েছিল দেশ-মহাদেশ, আজ সেই পথ প্রসারিত হয়েচে বিশ্বের দিকে; আমাদের সেদিনের সামান্য তীর্থযাত্রা আজ বিরাটের পদতল স্পর্শ করেচে। মন বললে, তুমি এই? এই তোমার রূপ?—যার জন্যে এলাম সে ত মন্দিরে নেই, সে যে আমার আছে পথে-পথেই! সামান্য মন্দিরে তুমি ত বন্দী নও।

গঙ্গার পুল পার হয়ে ঢুকলাম গ্রামে। গ্রামের নাম বদরিকাশ্রম; কেউ বলে বদরী বিশালা, কেউ বা নারায়ণাশ্রম প্রথমেই বাঁ-হাতি ছোট ডাকঘর। তারপরেই পথের দু'ধারে ছোট ছোট দোকান। আকাশ মেঘলা, ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়চে, বাতাসের বেগে ও অসহ্য ঠাণ্ডায় কোনোদিকে আর মুখ ফেরাবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট বাসায় এসে উঠলাম

বাসাটির আভিজাত্য অল্প নয়, বেশ পাকা পাথরের দোতলা বাড়ি। দরজা, জানলা, উপরে ওঠবার সিঁড়ি, সম্মুখে পাথরে



বদরীনাথ-ধাম

খাদরি-করা প্রকাণ্ড চত্বর। এটি আমাদের পাণ্ডার বাসা-বাটী। যে পাণ্ডাকে আমরা আশ্রয় করেচি তিনি এখানে বেশ প্রসিদ্ধ, নাম-ডাক আছে। তাঁরা পাঁচ ভাই। সূর্যপ্রসাদ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি। পুত্রের নাম পিয়ারীলাল। দেবপ্রয়াগেও এঁদের প্রতিনিধি আমাদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। প্রথমেই এঁদের অতিথি-সৎকারে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। নীচের ঘরে কতকগুলি কম্বল এনে এঁরা আমাদের জন্যে বিছিয়ে দিলেন, কাঠ এনে আগুন জ্বাললেন। এই আগুন আর কম্বল সেই দুর্যোগে আমাদের জীবন দান করলো। সূর্যপ্রসাদ এবং রাম-প্রসাদের মতো এমন ভদ্র ও সদালাপী পাণ্ডা তীর্থস্থানে অতি বিরল। প্রায় প্রত্যেক বাঙালী ও হিন্দুস্থানী যাত্রীই এঁদের বাসা-বাটীতে এসে ওঠেন।

দুর্যোগ ও ঠাণ্ডায় অকর্মণ্য হয়ে সমস্ত দিন ঘরের ভিতরে অতি অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো। মাছি নেই, কিন্তু কাপড়-চোপড় ও কম্বলে পোকার ভয়ানক উৎপাত। আহারাদি তথৈবচ। রান্নাবান্নার জায়গাও নেই, সুবিধাও নেই, শক্তিও নেই—অতএব অমরা সিংয়ের মারফৎ পুরি আনাতে হ'লো। ধন্য পুরি! পুরিই সর্বদেশে অগতির গতি।

কোথা দিয়ে কাটলো অপরাহ্ণ, কোন্ পথ দিয়ে এলো সন্ধ্যা। বাইরে টিপ্ টিপ্ করে তখনো বৃষ্টি পড়চে, বাতাস মাঝে মাঝে দরজা জান্‌লা কাঁপিয়ে ছুটছে, বন্ধ ঘরের ভিতর আগুনের চারি-

দিকে আমরা কয়েকজন ঘিরে বসে গল্প করচি, গোপালদা গুটি-গুটি উঠে তামাক টান্‌চেন। বামুন-বুড়ী পথ থেকে রোগ কুড়িয়ে এনে একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে নির্জীব হয়ে রয়েচে এবং সেই সুবিধা নিয়ে দুর্দম-শক্তি কঙ্কাল-দেহ চারুর-মা শুরু করেচে তার গৃহপালিত গোরুর গল্প। ধীরে ধীরে রাত্রি নিশুতি হয়ে এলো।

পরদিন প্রভাতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা সকলেই বিস্মিত হ'লাম। রাঙা রোদে চারিদিক হাসচে। আকাশ পরিচ্ছন্ন নীল। আশপাশের পাহাড়গুলির মাথায় স্তূপীকৃত বরফ রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে। নদীর ওপারে সমতল জায়গা-টুকুতে চাষের কাজ চল্‌চে, কোথাও কোথাও সামান্য বৃক্ষলতা বাতাসে মাঝে মাঝে আন্দোলিত হয়ে উঠচে, আমরা পরম তৃপ্তিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। এই রৌদ্রময় অলস দিনটি রেখে-রেখে উপভোগ করার মতো সৌভাগ্য হবে এ আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। মানুষের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর যেমন সুদিন আসে, আজকের এই সুনির্মল আলোকোদ্ভাসিত দিনটি তেমনি আমাদের উপরে বিধাতার আশীর্বাদের মতো নেমে এসেচে। আজ সকাল বেলা উঠে হাঁটতে হয়নি, সমস্ত শরীর বিশ্রাম পেয়েচে। কোমল উষ্ণ রোদে চক্ষু বুজে বসে রইলাম।

মন্দির ও ঠাকুর দর্শনের আগ্রহ আমার নেই শুনে অনেকেই চোখ কপালে তুলে নানা মন্তব্য করে বসলো এবং যখন শুন্‌লো

বমূর্তির সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ অথবা কৌতূহল বিন্দুমাত্রও ই, পূজাও দেবো না, মুক্তিও চাইবো না—তখন তাদের সমস্ত হারাই গেল বদ্‌লে।

'কিছু না হোক, পেন্নামও ত একটা করবে বাছা?'

'কা'কে?'

'কা'কে! গা জ্বলে যায় বাছা তোমার কথা শুনলে। তা লে বলো বাপ-পিতামো'র মুখে একটু জলও দিয়ে যাবে না?'

ব্রহ্মকপালীতে এখানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা ধি। জনশ্রুতি, স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ স্বর্গদ্বার থেকে অঞ্জলি াসারিত করে উত্তর-পুরুষের নিকট এইস্থলে পিণ্ড গ্রহণ করেন। ীরীকুণ্ডের মতো এখানেও একটি উষ্ণ জলধারা আছে, যাত্রীরা তি আরামে সেই জলে স্নান করে। পথের ধারে আর একস্থলে াছে একটি ঈষদুষ্ণ ঝরনা, এই জলে স্নান করলে শরীর সতেজ য়ে ওঠে, সুতরাং এর প্রতিই যাত্রীদের আগ্রহ সকলের চেয়ে শী। গঙ্গায় একটি লোককেও স্নান করতে কিংবা জল ব্যবহার রতে দেখা গেল না। তুষারাচ্ছন্ন গৈরিকবেশা গঙ্গাকে স্পর্শ রার মতো দুঃসাহস কারো নেই।

স্খলিত দেহ, নগ্ন পদ, মলিন পরিচ্ছদ, বীতস্পৃহ উদাসীন ন, এক সময় ধীরে-ধীরে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে প্রবেশ রলাম। জাতি-নির্বিশেষে যাত্রীর দল ভিতরে কোলাহল জুড়ে য়েচে। আজ সবাই এসে পৌঁছেচে তাদের পরম লক্ষ্যে, মুখে

ফুটেচে তৃপ্তির হাসি। কারো শরীর রুগ্‌ণ, কেউ ক্ষত-বিক্ষ
কেউ হাঁটচে খুঁড়িয়ে, কেউ বা ভগ্ন-কণ্ঠ—তা হোক, আ
আপন ললাটে তারা জয়টিকা পরেচে। মন্দিরের ভিতরে অন্ধকা
নানা অলঙ্কার ও আভরণে আবৃত বদরীনাথকে স্পষ্ট করে দ
করা এক দুরূহ ব্যাপার। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মূ
আশেপাশে ছোট ছোট দেব-দেবী। মূর্তিটি ছোট। সম্মু
অন্ধকারে ঘৃতদীপ জ্বলচে, নিকটেই অন্নভোগ থরে থরে সাজানে
শ্রীক্ষেত্রের মতো এখানের অন্ন সম্বন্ধে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের ভে
ভেদ নেই।

এতদিনের পথশ্রম এত সামান্যতেই আজ শেষ হয়ে গেল
দুঃখ, পীড়ন, কাতরতা, উপবাস ও পথশ্রম, এত কৌতূহল, ব্যথ
বেদনা ও আয়োজন—সমস্ত এসে থামলো এক প্রস্তর-মূর্
পদপ্রান্তে! কত মৃত্যু-মহামারী, কত ক্লেশ ও উৎপীড়ন, ক
পথের কত ঘটনা ও সংঘাত—আজ কি তার কোনো মূল্য নেই

কে বলেচে মূল্য নেই? কত যুগ-যুগান্তর, কত কালকালান্ত
ব্যাপী লোকপ্রবাহ অবিশ্রান্ত ব'য়ে এসেচে এই বিরাটের তী
কোটি কোটি পিপাসার্ত হৃদয় মুক্তি-বাসনায় বিগলিত অশ্রু
ভেঙে পড়েচে এর চরণপ্রান্তে,—আজ আমার মতো নগ
মানুষের শিথিল সন্দেহ আর অবিশ্বাসবাদে তার মূল্য কি যা
ক'মে? এত বড় অহঙ্কার ত আমার নেই!

চারিদিকে একবার তাকালাম। সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলির ভিত



বদরীনাথ মন্দির

আমার কেমন একটা অদ্ভুত আন্দোলন জেগে উঠেচে। এরই নাম কি নাস্তিকের আত্মগ্লানি? এ'কেই কি বল্‌ব অবিশ্বাসবাদীর অবচেতন প্রতিক্রিয়া? কিন্তু ঘুচে যাক্‌ আমার প্রকৃতিগত অহঙ্কার, মুছে যাক্‌ আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিষ্ফল দম্ভ,—আমি এদেরই একজন, এদেরই মতো ভক্তিরসের প্লাবন-বন্যায় আমিও ভেসে যেতে চাই। তাদের সকলের সম্মিলিত প্রার্থনার ভিতরে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে আমারো বলতে ইচ্ছা হ'লো, হে দেবাদিদেব, আমার সন্দেহ আর অবিশ্বাস দূর করো, দূর ক'রে দাও যত কিছু জঞ্জাল! হে পরশরতন, যত মালিন্য, যত কুরূপ, যত বিরূপতা, যত কিছু আবরণ,—তোমার স্পর্শে যেন সব সুন্দর হয়ে ওঠে। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে যারা তোমার দর্শন-কামনায় ওই দুর্যোগ-দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে দলে দলে এসেচে, মহাকালের স্রোত-তাড়নায় দলে দলে যারা অদৃশ্য হয়ে গেচে, হে ঠাকুর, যুগ-যুগান্তরের সেই কোটি কোটি অগণ্য আর নগণ্য নরনারীর মোক্ষ-লাভের অতৃপ্ত বাসনা আমার এই তৃষাতুর হৃদয় আশ্রয় করেচে,—তুমি এ'কে মুক্তি দাও! অবিশ্বাস নয়, সন্দেহ নয়, মোহ নয়,—আমি সেই আবহমানকালের হিন্দু, সেই চিরন্তন হিন্দুকুলে আমার জন্ম, আমার শিরার রক্তে হিন্দুর সেই আদিম শুচিতা-বোধ,—তোমার চরণের তলায় আমিও যেন দলিত হই, ধন্য হই, কৃতার্থ হই!

ভারাক্রান্ত মনে আবার পথ পার হয়ে এসে বাসার ধারে

বসলাম। নীল আকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে, দুই ধারের ফেন-শুভ্র তুষারময় পর্বত-চূড়াগুলিতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে অপরূপ শোভা বিকীর্ণ করেচে, মহাযোগীর আলম্বিত জটার মতো বরফের ধারাগুলি ঝরনার আকারে নীচে নেমে এসেচে। দূরে মাঝে মাঝে বেজে উঠচে মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা। ওপারের পাহাড়ের নীচে একখানি সরকারি বাংলো, তারই পাশে কোমল সবুজ চাষের জমি। তিন চার মাসের মধ্যে যেটুকু ফসল উৎপন্ন করা যায়,—তারপরেই শরৎকাল থেকে আবার এ-রাজ্য ধীরে-ধীরে বরফের গর্ভে সমাধিস্থ হয়ে যাবে; গ্রামবাসীদের নেমে যেতে হবে নীচে। বদরীনাথের মন্দির অদৃশ্য হবে, পূজারী রাওল মহাশয় গিয়ে বাস করবেন যোশীমঠে, সেখানে থেকেই শীতকালে তিনি বদরীনাথের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করবেন।

গ্রামের চেয়ে বদরীনাথকে ক্ষুদ্র শহরও বলা যেতে পারে! ওইটুকুই একটিমাত্র পাথর-বাঁধানো দু'শো গজ আন্দাজ লম্বা পথ, কিন্তু তার উপরেই দু'ধারি দোকানের সারি। কাপড়-চোপড়, বেনে-মসলা, চাল-ডাল, মণিহারি, পুরি-কচুরি—অনেক-গুলি দোকান। বিস্মিত হ'লাম এক জায়গায় একখানি ছবি ও বইয়ের দোকান দেখে। কি ভাগ্যি নাটক-নভেল নয়,—ধর্মগ্রন্থ। তার চেয়েও বিস্মিত হ'লাম যখন অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'লো চা ও পানের দু'খানি দোকান। খুশী হয়ে চা খাওয়া গেল।

শীতের হাওয়ায় গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পিতৃমাতৃহীন বালকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সন্ধ্যার তখনো বিলম্ব ছিল। পথের দক্ষিণ দিকে কয়েকখানি 'শিলাজিৎ' ও চামরের দোকান দেখে দেখে যাচ্ছিলাম। এ দু'টি বস্তু অতি দুষ্প্রাপ্য। শিলাজতু হচ্চে পাহাড়ের ঘাম। কোনো কোনো বিশেষ পাহাড়ের এক অলক্ষ্য চূড়ায় আলকাৎরার ন্যায় এই বস্তুটি মধুর মতো এক জায়গায় প্রকৃতির খেয়ালে জমা হতে থাকে। মানুষ একদা এই বস্তুটি জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করে ভাবলো, খেতে মন্দ না। চাখতে গিয়ে উদরসাৎ করলো। দেখা গেল শরীরের পক্ষে পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক একরূপ স্বদেশী সানাটোজেন। অমনি ছুটলো পাহাড়ে পাহাড়ে, হিমালয়ের ঘাম শোষণ করে এনে ভরি দরে বিক্রী করতে লাগলো। ভালো এক ভরি শিলাজিতের দাম আট আনা। তারপর চামর। হিমালয়ের তুষারদেশে 'সুরা' গাই দেখা যায়, কেউ বলে 'চামরী' গাই। কঠিন বরফের ভিতরে তারা বিচরণ করে। তুষারের মতো সাদা দেহ, ল্যাজগুলি সুন্দর। ব্যস, আর কি, আন্ সেই গোরুর ল্যাজ কেটে। হিন্দুর ছেলে কাটলো গোরু এবং তার ল্যাজের সঙ্গে হাতল বেঁধে গৃহপালিত পশুপতিকে ব্যজন শুরু করলে।

বড় একখানা দোকানে উঠে চামর আর শিলাজিৎ (শিলাজতু) পরীক্ষা করছিলাম। গোপালদা আছেন পাশে, এ দু'টি বস্তুর প্রতি তাঁর ভয়ানক মোহ। দর-দস্তুর করবার জন্য

তিনি আমাকেই স্বমুখে ঠেলে দিলেন, আমি একেবারে পাগলের মতো অনর্গল উর্দু মিশ্রিত হিন্দী ভাষা ছুটিয়ে দিলাম। দোকানে প্রচুর জটলা, স্ত্রী-পুরুষের ভিড়ে দোকানদার একেবারে হকচকিয়ে গেচে। তার জিনিসপত্র ওলোটপালট করে মনের মতো ছোট চামরটি খুঁজছিলাম।

হাত বাড়িয়ে একটি চামর ধরতেই অন্যদিক থেকে আর একখানা হাত এসে তার উপর চেপে বসলো। যে হিন্দুস্থানী মেয়েটি এতক্ষণ ঝাঁ-ঝাঁ করে সমস্ত দোকানখানাকে কথায়-বার্তায় হাসিতে-তর্কে ও দরকসাকসিতে আলোড়িত করে তুলেছিল এ হাতখানি তারই। স্ত্রীলোক ব'লে বেশি স্ববিধা দিতে আমি রাজী নই, চামরখানি হাতের মধ্যে টেনে নিলাম।

'ওইটি কিন্তু আমার পছন্দ, দিন আমাকে।'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে চামরটি তাঁর কাছে এগিয়ে দিলাম। ভিড়ের ভিতরে গলা নামিয়ে বললাম, 'আপনি বাঙালী?'

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, 'কী দেখে সন্দেহ হচ্ছে? হিন্দী শুনে?—কই, দিদিমা গেলেন কোথায়? আমাদের চৌধুরী মশাই?—ও হরি, ওঁরা দেখচি ওদিকে দোকানসুদ্ধু তুলে নিয়ে যাবেন। এ চামরটা আপনার কেমন লাগে?'

বললাম, 'বেশ জিনিসটি, ছোটখাটো, দামও কম, দশ আনা মাত্র।'

তিনি বললেন, 'দাম বেশীও দিতে পারি যদি মনের মতন

য়। বেশ, এইটিই আমি নিলাম, কিছু মনে করবেন না। আমার ঘরে আছেন নারায়ণ, তাঁর জন্যেই—' এই বলে তিনি আবার দোকানদারের সঙ্গে শিলাজিৎ সম্বন্ধে আলাপ জুড়ে দিলেন।

নিজের হিন্দী বুলিকে সংযত করলাম, এঁর সঙ্গে পেরে উঠবো না, হয়ত এখুনি কী বলতে কী বলে বসবো,—দরকার নেই।

'আপনি এখানে কি করতে এসেছেন ?'—আপাদমস্তক তিনি একবার তাকালেন আমার দিকে।

'এসেচি তীর্থে—সবাই আসে যে জন্যে।'

'তীর্থে !'—ঠোঁট উলটে তিনি হঠাৎ এমন অবজ্ঞার হাসি হাসলেন যে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে গেলাম, এবং একটি মুহূর্তে আমার এই ছাব্বিশ দিনের সমস্ত তীর্থযাত্রাটাই যেন মিথ্যে হয়ে গেল। বললেন, 'তীর্থ করবার বুঝি এই বয়স আপনার ? ও হরি, আপনার সাজসজ্জাও যে আধা-সন্নিসির !'

কানে তাঁর কথাগুলি তিরস্কারের মতো বাজলো। একটু-খানি থতিয়ে গোপালদার কাছ ঘেঁষে বসলাম। তাঁর দীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে আমি মুহূর্তে সঙ্কুচিত হয়ে উঠেচি। দেখতে দেখতে দিদিমা আর চৌধুরী মশাই এসে দাঁড়ালেন। সহজেই আলাপ হয়ে গেল। জিনিসপত্র কিনে সবাই উঠে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন পাণ্ডা সূর্যপ্রসাদ। স্বর্গদ্বার সম্বন্ধে আলোচনা উঠলো।

স্বর্গদ্বার যেতে গেলে বরফের ভিতর দিয়ে দু'দিন হাঁট্তে হয়, মানুষের অগম্য পথ। স্বর্গদ্বারের পথ গিয়ে মিলেচে 'শতপন্থে' এই পথের প্রথম প্রান্তে পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী ভূতলশায়িনী হয়ে ছিলেন,—মহাপুরুষ এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী ছাড়া সাধারণ মানু সেখানে যেতে অপারগ। এখান থেকে মাইল ছয়েক পথ বরফের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলে বসুধারার দৃশ্য দেখা যায়। বসুধারা একটি তুষারের প্রপাত। বরফের উচ্চ চূড়া থেকে একটি বায়ু-তাড়িত জলধারা অসংখ্য বিন্দুতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, অনেকটা নিম্নগামী ফোয়ারার মতো,—তারই নাম বসুধারা। পথে দাঁড়িয়েই গল্প চলছিল, এমন সময় জ্ঞানানন্দ স্বামী—যাঁর সঙ্গে প্রথম হরিদ্বারে আলাপ, তিনিও সদলবলে এসে পৌঁছেচেন, আমাদের আলাপে তিনিও যোগ দিলেন। এখান থেকে ফেরবার পথে যোশীমঠ দিয়ে কৈলাসযাত্রার একটা বাসনা আমার মনে মনে ছিল, অতএব উঠলো কৈলাসের কথা।

চা পানের পর গরম পুরি সংগ্রহ করে শীতের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে বাসায় এসে উঠলাম। তখন পাহাড়ে পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নামচে। রৌদ্রের উত্তাপটুকু রৌদ্রের সঙ্গেই চলে গেচে, আবার উঠেচে বরফের আভাস। ভিতরে আগুন জ্বলচে; তারই চারিপাশে বুড়ীর পাল নিতান্ত গ্রাম্য আলাপে মত্ত।

দেখতে দেখতে বুড়ীদের কথাবার্তা থেমে এলো, এক একজন

করে ঘুমিয়ে পড়চে। ঘরের কোণে হারিকেন্ লণ্ঠনটা কমানে', একপাশে কাঠের আগুন গন্ গন্ করচে, ভিতরটা বেশ গরম হয়ে উঠেচে। পাশে গোপালদা কম্বলের তলায় কোথায় হারিয়ে গেলেন, তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই। তাঁর ধারণা, এই বন্ধ ঘরের মধ্যেও কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বার করলেই তিনি ডবল্ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবেন। আমারো চোখে তন্দ্রা এসেছিল।

বাইরে একটা শোরগোল শোনা গেল এবং সে কোলাহল যে একদল বাঙালীর সহজেই বুঝলাম।

'কে আছ গো, একটু আলো দেখাও না বাবা, পথটা দেখে নিই? দয়া করে একটু আলো দেখাও না বাছা, ভারি অন্ধকার।'

'কোন্ দিকে কিছুই বুঝতে পারচিনে, সেই সিঁড়িটা কোথায় গেল?'

কম্বল ছেড়ে উঠে আলোটা বাড়িয়ে হাতে নিয়ে বাইরে এলাম—'আহা এসো বাবা এসো।'

একজন বললেন, 'বোঝা গেল তোমার গায়ে মানুষের চামড়া আছে, এত ডাকাডাকি করচি এই শীতে—'

'এইদিকে একটু ধরুন ত আলোটা,—ইয়া, ঠিক হয়েচে!'

'ওমা, এই যে বাবা তুমিই উঠে এসেচ দেখচি, আহা বেঁচে থাকো।'

রাত্রে যে ঝড় উঠেছিল, পরদিন সকালের রৌদ্রে উঠে দেখি সমস্ত শান্ত হয়ে গেচে। আকাশে আর কোনো মালিন্য নেই, দিগ-

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

দিগন্ত পরিচ্ছন্ন নীলাভায় ঝলমল করচে। যাত্রীর দল আজ ভাবতে শুরু করেচে দেশের কথা, আত্মীয়-পরিজনের কুশল। গভীর নিদ্রা থেকে আজ সবাই জেগে উঠেচে। এবারের পালা সঞ্চয়ের। কেউ নিচ্চে তীর্থের 'সুফল', কেউ ঠাকুরের প্রসাদ, কেউ ছবি ও বই। অনেকে পথ থেকে কাঁচা সিদ্ধির গাছ ছিঁড়ে এনে রোদে শুকোতে দিয়েচে। যাদের আর ধৈর্য নেই, তারা বসে গেচে চিঠি লেখাতে, এখানকার ডাকঘরের ছাপ দিয়ে দেশে পাঠাবে। আজ আর কোনো তাড়া নেই, সবাই নিচ্চে বিশ্রাম, গাল-গল্প চল্‌চে, কেউ ঔষধপত্র সংগ্রহ করচে, কেউ খুঁজচে কাণ্ডি—তার আর হেঁটে ফেরবার সামর্থ্য নেই। মাঝে মাঝে সূর্যপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ মধুর আলাপে ও ব্যবহারে যাত্রীদের আপ্যায়িত করে চ'লে যাচ্চেন।

পূর্ণযাত্রা

পুনরাগমন

"পথের সাথী, নমি বারম্বার।

পথিক জনের লহ নমস্কার।

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি,

ভাঙা বাসার লহ নমস্কার।

ওগো নব-প্রভাত-জ্যোতি,

ওগো চিরদিনের গতি,

নূতন আশার লহ নমস্কার।

জীবন রথের হে সারথি, আমি নিত্য-পথের পথী,

পথে চলার লহ নমস্কার।"

তিন দিন বাস করে ১৫ই জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে আমরা শেষ বিদায় ও অভিবাদন জানিয়ে অখণ্ড পুণ্য সঞ্চয় করে পরিতৃপ্ত মনে রওনা দিলাম। নষ্ট স্বাস্থ্য ও লুপ্ত শক্তি যেন কোন্ এক মন্ত্রবলে ফিরে পেয়েচি। নূতন উৎসাহ ও নব অনুপ্রেরণা, সতেজ প্রাণধারা,—এমন সুস্থ ও সহজ আর কোনোদিন বোধ করিনি। যত অস্বাস্থ্য ও ক্লেদকালিমা রেখে এলাম বদরীনাথে। স্ফীত দেহ, উল্লসিত মন, চলৎশক্তিমান দু'টি পা, রক্তের উত্তেজনা ও একটি অপরিমেয় প্রাণলীলা নিয়ে চলেচি সঙ্গে। আমাদের নবজন্ম হয়েচে। প্রভাতে ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে লাঠি দুলিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চললাম। দু' ঘণ্টায় এলাম হনুমান চটি, মধ্যাহ্নে এলাম পাণ্ডুকে-

শ্বর। সন্ধ্যার পরে গিয়ে পৌঁছলাম বিষ্ণুপ্রয়াগ ও যোশীমঠ পার হয়ে একেবারে সিংহদ্বারে। রাত্রে শয়নের সময় হিসাবে দেখা গেল, আজ আমরা উনিশ মাইল পথ হেঁটেচি! অসীম শক্তি এখন আমাদের পায়ে।

পথ আমাদের পরিচিত, কোথায় কী আছে জানি। আপাতত লালসাঙ্গায় আমাদের ফিরে যেতে হবে, সেখান থেকে নূতন পথে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবো। সকলের এখন তাড়াতাড়ি। তীর্থ শেষ হয়ে গেচে, পাহাড়ের দেশ হয়ে উঠেচে অসহনীয়, আরো দশ এগারো দিন আন্দাজ হেঁটে ট্রেনে উঠতে পারলে হয়—সমতল দেশ দেখবার জন্য সকলের মন হা হা করচে। আমরা প্রত্যেকদিন এখন বুঝতে পারি কোথায় সারবো মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং কোথায় করা যাবে রাত্রিবাস। দ্বিতীয় দিন আমরা গরুড়গঙ্গায় রাত কাটালাম। সিংহদ্বার থেকে গরুড়গঙ্গা ষোলো মাইল। পরদিন মধ্যাহ্নে পৌঁছলাম বাবলা চটি, আহারাদির পর আবার রওনা হয়ে বিকালে লালসাঙ্গায়। তিনদিন হেঁটে এবার আমরা ক্লান্ত হয়েচি। হাঁটতে হাঁটতে আবার কানে লেগেচে তালা, মন হয়ে উঠেচে উদাসীন, স্মৃতিশক্তি গেচে কমে। যাই হোক, খোঁজখবর করে নির্মলা তার সেই হারিকেন্ লণ্ঠনটা আবার উদ্ধার করে নিল। সন্ধ্যার তখনো কিছু বিলম্ব রয়েচে, লালসাঙ্গায় না দাঁড়িয়ে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এবার পেয়েচি নূতন পথ, হরিদ্বার থেকে এই পথ এসেচে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে। নূতন

পথে দু'মাইল গিয়ে সেদিনের মতো আশ্রয় নিলাম। তিনদিনে হাঁটা হলো পঞ্চাশ মাইল পথ।

আবার প্রভাতে যাত্রা। পথে পথে বিশ্রাম নেওয়া, গোপালদার তামাক খাওয়া, আফিম গেলা, আবার হাঁটা। দু'একজন ছাড়া বুড়ীরা উঠেচে সবাই কাণ্ডিতে, সারবন্দী হয়ে কাণ্ডিওয়ালারা চল্‌চে। সকাল বেলায় আমরা শ্রীনন্দপ্রয়াগ পার হয়ে চললাম। এখানে দেখা গেল নন্দা ও অলকানন্দার সঙ্গম। প্রবাদ, রাজা নন্দ পূর্বকালে এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। ছোট্ট একখানি শহর। এখান থেকে গরুড়ে যাবার নূতন রাস্তা শুরু হয়েচে। নন্দপ্রয়াগে মহেশানন্দ শর্মার দোকান থেকে কয়েকখানি হিমালয়ের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা গেল। খাঁটি শিলাজতুর জন্য এই দোকানখানি বিখ্যাত। শীত কমে গেচে, রৌদ্র উঠচে প্রখর হয়ে। কোথাও পাহাড় ছেড়ে পাহাড়ে, কোথাও বা পাহাড় থেকে পাহাড়ে নামচি। পথ এখনও অনেক বাকি; মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছলাম সোনলা চটি এবং সন্ধ্যায় গিয়ে উঠলাম জয়কণ্ডীতে। মাঝখানে রইলো লঙ্গাসু চটি।

পরদিন বেলা আন্দাজ ন'টার সময় কর্ণপ্রয়াগের তীরে এসে পৌঁছলাম। সম্মুখে উপলখণ্ডময় বিপুল বিস্তৃত নদী, পিন্দার গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। প্রবাদ, নদীর তীরে পর্বত-সমীপে একদা কুন্তীপুত্র কর্ণ পিতা সূর্যদেবের দর্শন পেয়ে অভেদ্য কবচাদি বর লাভ করেছিলেন। নদীর ওপারে দক্ষিণের পথ গেচে

রুদ্রপ্রয়াগের দিকে, বাম দিকের পথটি সোজা চলে গেচে মেহলচৌরীর উদ্দেশে। আমরা এইখান থেকে অলকানন্দাকে বিদায় দেবো। যাত্রীরা নদীর সঙ্গমে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে।

নদীর পুল পার হয়ে সম্মুখে একটা দীর্ঘ চড়াই পাওয়া গেল। ফেরবার মুখে চড়াই-পথ বড় গায়ে বাজে। উপায় নেই, হাঁপাতে হাঁপাতে শহরে এসে উঠলাম। বেশ বড় শহর। বড় বড় পাহাড়ী রাস্তা, সরকারি বাংলো, হাসপাতাল, দোকান-বাজার,—একান্তে একটি মান্যগণ্য ডাকঘর, পুলিসের থানা। জল-হাওয়া চমৎকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ধর্মশালার দোতলায় এসে উঠলাম। খাঁটি গরম দুধ এবং সুস্বাদু জিলিপি কর্ণপ্রয়াগের দু'টি উপাদেয় বস্তু।

যথারীতি রান্নাবান্না এবং আহারাদি। এখানে একটি বিচ্ছেদের পালা ঘট্‌লো। আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, দুর্যোগ ও দুর্দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, পথনির্দেশক, ছোড়িদার অমরা সিং এখান থেকে বিদায় নেবে। আজ মনে পড়লো, সে আমাদের আত্মীয় নয়, সে পর, তাকে চলে যেতে হবে। দেবপ্রয়াগের দিকে কোন্ এক দুর্গম পর্বতের চূড়ায় তার ছোট্ট একখানি গ্রাম। ঘরে তার পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী এবং নববিবাহিতা পত্নী বর্তমান,—যাত্রীর দলকে মেহলচৌরীর পথে ছেড়ে দিয়ে চলে তাকে যেতেই হবে। মানুষের পরিচয় ব্যবহারে, মানুষ আত্মীয় হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতায়। দুঃখের দিন, দুর্যোগের রাত যাকে নিয়ে

অতিবাহিত করেছি, সে বন্ধু, সে পরমাত্মীয়, তাকে ছাড়তে গেলে বুকে বড় বাজে, মনের ভিতর থেকে প্রাণপণ শক্তিতে যেন একটা শিকড় উৎপাটন করে ফেল্‌তে হয়। অম্‌রা সিং পথের মানুষের হৃদয় জয় করেচে,—বিজয়ী সে, ভাগ্যবান সে।

যার যা সাধ্য,—কাপড়, চাদর, জামা, গামছা, কম্বল ও টাকা,—অকৃপণ হাতে তার ঝুলিতে সবাই ভরে দিল। বদরীনাথ যা পাননি তাই পেলো অম্‌রা সিং। দেবতা পান পূজা, মানুষ পায় প্রীতি। অম্‌রা সিং আমাদের বড় আপন, আপনার চেয়েও আপন।

এবারে ভার পড়লো আমার উপর যাত্রীদের চরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে চলেচে জ্ঞানানন্দের দল। অম্‌রা সিংয়ের কাছে পথ সম্বন্ধে নানা উপদেশ গ্রহণ করে বেলা তিনটে নাগাৎ আবার আমরা যাত্রা করলাম। কথা রইলো আমি যাবো সকলের পিছনে পিছনে। পথে তখনো রৌদ্র প্রখর হয়ে রয়েচে।

গাড়নদীর তীরে তীরে পথ এবার একটু সমতল, নদীতে নেমে এবার সহজেই জলের তৃষ্ণা মেটানো যায়। আস্তে আস্তে চলেচি, সকলের পিছনে পিছনে। নদীর ওপারে কোথাও কোথাও গ্রামের চিহ্ন দেখা যাচ্চে। নদীর জলে তখনো রোদ ঝিক্‌মিক্‌ করচে। সমতল পথ পেয়ে হাঁটার সুবিধে হয়েচে। গোপালদাকে আজ এগিয়ে যেতেই হবে, আগে আগে গিয়ে

চটিতে স্থান দখল না করলে, রাত্রে ভারি অসুবিধা হয়। অমরা সিং নেই, অতএব এবার থেকে আমাদেরই সব দেখে-শুনে নিতে হবে।

কয়েক পা পিছনে হেঁটে পথের একটা বাঁকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চৌধুরী মশায়ের দলটাকে দেখতে পেলাম। একটা জটলা জমেচে। নাত্‌নী তার মাঝখানে পাহাড়ের একটা খাঁজে পা রেখে ঘোড়ায় ওঠবার চেষ্টা করচেন। একটা হাসাহাসি চল্‌চে। দূর থেকে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন, 'আপনি মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে যান, নৈলে আমার ঘোড়ায় ওঠা হবে না।'

তথাস্তু। আবার ফিরে চল্‌তে শুরু করলাম। বেশ জোরে জোরেই পা চালিয়ে দিলাম। মাইলখানেক আন্দাজ একাকী চলে গিয়ে খটাখট্‌ শব্দে ফিরে দেখি, অশ্বারোহিণী কাছাকাছি এসে পড়েচেন। সঙ্গে সঙ্গে আছে একটা সহিস। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। ঘোড়ার গতি মন্থর হ'লো। দড়ির রাশ দুই হাতে ধরে তিনি বললেন, 'নমস্কার!'

'নমস্কার।'

'ভালো আছেন ত? ভাবছিলাম বুঝি আর দেখা হ'লো না,—পথ ত ফুরিয়ে এলো। আপনার সঙ্গে সেই বুড়ো লোকটি, তাঁকে দেখতে পেয়ে পথে তবু যা হোক একটু আশ্বস্ত হলাম। বুঝলাম, শীতের পরেই বসন্ত! খুব তাড়াতাড়ি এসেচেন যা হোক।'

'আপনাদের সব ভালো ?'

'সব ভালো নয়। আমার পায়ের তলায় ব্যথা, দিদিমা কিছুতেই শুনলেন না, একটা ঘোড়া জুটিয়ে দিলেন। আপনি এখন দেশে ফিরবেন ত ?'

'তাই ভাবচি।'

তিনি হেসে বললেন, 'এখনো ভাবচেন ? ধন্য ভাবুক আপনি ; আপনার মুখের সঙ্গে বোধ হয় মনের মিল নেই ! এত ভাবচেন কী ? হাত-পা ছেড়ে ভেসে যান্।'

যেন একটা প্রাণের ঝড় বইচে, জীবনের প্রাচুর্য। নির্বাক হয়ে চলেচি।

'আপনারা সব বেরিয়েচেন পুণ্য করতে, আমার ও-সব নই। বহু তীর্থে গেচি, কিন্তু তীর্থ করতে নয়, এম্‌নি।' হেসে পুনরায় বললেন, 'আমার বেশ লাগে ঘুরে বেড়াতে। দেশ-বিদেশের নামে আমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সত্যি বলচি আপনাকে।'

রাঙা রৌদ্র উঠলো পাহাড়ের মাথায়, দিন এলো অবসান হয়ে। কোনো কোনো পাহাড়ের গর্ভে এরই মধ্যে অন্ধকার জম্‌চে। নদীর একদিকে শ্বেতকরবীর জঙ্গল, আর একদিকে কাঁটাবন। নদীর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে আলাপ চলচে।

'এ কিন্তু আমার বিশ্রী লাগচে, আমি যাবো ঘোড়ায় আর আপনি যাবেন হেঁটে,—চচ্ চচ্, কি রে, জল খাবি নাকি ?—

আমার কলেবরের ভারটি ত কম নয়, ক্ষণে ক্ষণে বেচারার গল শুকিয়ে উঠচে—' ঘোড়ার ঘাড়ে তিনি একবার হাত বুলিে দিলেন।

সেমালী চটি ছেড়ে সিরোলী চটির কাছাকাছি এসে পড়েচি কথা কইতে কইতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ পার হয়ে গেচে! তিি একবার পিছন ফিরে তাঁর দলের পথের দিকে তাকালেন।

'আমার ঘোড়ার নাম কী জানেন?—বিন্দু! এর ছেলে নিয়ে তা বলে শরৎ চাটুয্যে গল্প লেখেননি!'

দু'জনের হাসিতে পথ মুখরিত হ'লো। মোড় ঘুরতেই চা পাওয়া গেল। বৃক্ষচ্ছায়াময় ফলের বাগানে ঘেরা সিরোলী চটি ঘোড়া থেকে নেমে তিনি পথের ওপারের চটিতে গিয়ে উঠলেন আমি এলাম এপারে গোপালদার আশ্রয়ে।

রাত্রে দিদিমার সঙ্গে পরিচয় হ'লো। মেয়েরা সুবিধা পেলে সহজেই পারিবারিক গল্প টেনে আনে। তাঁদের বাড়ি কাশীতে পরিবার-পরিজন সম্বন্ধে নানা আলাপ চল্‌তে লাগলো। তিনি নাতনীর যে পিতৃপরিচয় দিলেন তা'তে সহজেই চিন্‌তে পারলাম নাতনীর নাম রাণী।

'মা-বাপ নেই, স্বামীর হ'লো অকাল মৃত্যু, ছেলেটি করতে সরকারি চাক্‌রি। এখন মামার বাড়িতেই প্রায় থাকে অল্প বয়সে এই অবস্থা হ'লো—কি ভাগ্যি যে, কিছু মাসোহার পায়।'

প্রভাতের রৌদ্রে চারিদিক আলোকিত হয়েচে। আজকের পথ আবার পর্বত-গহ্বরে প্রবেশ করেচে। ভটৌলী চটি পার হয়ে অনেক দূরে এসে পড়েচি। দল-বল সবাই এগিয়ে গেচে। গোপালদা একবার একটু বসে তামাক খেয়ে চলে গেচেন। মেহলচৌরী পর্যন্ত পথটা শেষ করে দেবার জন্য সকলেরই পায়ে একটা তাড়া আছে। আগে ছিল পথ অতিক্রম করার একটা কঠিন সাধনা, এখন সে সাধনাও নেই, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিও নেই, আজকাল পথের প্রতি সকলেরই বিতৃষ্ণা।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে পিছন ফিরে দেখি, দূর থেকে আসচেন অশ্বারোহিণী। পিছনের নদী ও পর্বতের পটভূমিকায় তাঁকে ঐতিহাসিক যুগের দুর্গাবতী কিংবা লক্ষ্মীবাঈ বলে মনে হচ্চে। ঘোড়ার পিঠে বসবার ভঙ্গীটি বেশ তেজোদীপ্ত। পরনে পরিচ্ছন্ন সাদা একখানি থান্, মাথায় অল্প ঘোমটা, গায়ে সেই ঘন বেগুনি রঙের চাদরখানি।

কাছাকাছি এসে সহাস্যে বললেন, 'ভাগ্যি আপনি যান্‌নি কৈলাসে!'

বললাম, 'ভাগ্যি আপনি এসেছিলেন বদরীনাথে!'

এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে আধবদরি এসে পড়লো। সুমুখেই চত্বরের উপরে নারায়ণের একটি প্রাচীন মন্দির, মন্দিরের গায়ে ধরেচে বহু ফাটল,—তারই পিছনদিকে কাছাকাছি অতি জীর্ণ-শীর্ণ একখানি গ্রাম। কাছেই একটি স্বচ্ছতোয়া ঝরনা।

লোকের ধারণা এখানকার ঝরনার জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি উপকারী। ঠাণ্ডায় আজ অনেকখানি পথ আসা গেচে, আরো এখনো অনেকখানি যাওয়া যাবে। নিতান্ত ক্লান্ত না হলে এবেলা আর কেউ চটিতে আশ্রয় নেবে না। দেখা গেল, আধবদরির ঠাকুর-দর্শনের জন্য সকল দল এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েচে। বুঝলাম, সুমুখের দোকানে কিছু জলযোগ করে আবার সবাই হাঁট্‌তে শুরু করবে। সুতরাং আবার অগ্রসর হলাম।

অগ্রসর হলাম বটে কিন্তু আজ সকাল থেকে এই নদী, আকাশ, পর্বত ও দূরের গ্রামগুলির নিকট ইঙ্গিত পেয়ে ভিতর থেকে মহাকবির কবিতার কয়েকটি ছত্র স্বত-উৎসারিত হচ্চে—

'দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যু-তরণ শঙ্কা-হরণ দাও সে মন্ত্র তব।'

ক্ষেতী চটি পার হতেই সূর্য এলেন প্রায় মাথার উপরে। পথ এবার চড়াই এবং সঙ্কীর্ণ। মানুষের সমাগম আর কোথাও দেখা যাচ্চে না, দুই ধারের অরণ্য নিবিড় হয়ে এসেচে। দুই পাশে বৃক্ষলতার ঘন জটলায় এই পরিদৃশ্যমান দিবালোক মাঝে মাঝে ছায়ান্ধকারে আবৃত হচ্চে। ঝিল্লীরব শুনতে পাচ্চি। অরণ্য-পুষ্পের সংমিশ্রিত গন্ধে পথের হাওয়া কোথাও কোথাও ভারা-

ক্লান্ত। লতাবিতানের ফাঁকে ফাঁকে বসন্তের বাতাস থেকে থেকে আপন উচ্ছ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠচে।

চড়াইটা পার হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে এসেচে। সহিস ছিল পিছনে পিছনে, এবার সে স্নমুখে এসে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টান্‌তে টান্‌তে উঠতে লাগলো। পথটা অতিরিক্ত কর্কশ এবং ভাঙাচোরা।

'এত বেলা, নাওয়া-খাওয়া নেই, আপনার নিশ্চয় চল্‌তে কষ্ট হচ্চে।'

বললাম, 'আমিও সেই কথাই ভাবচি। এমন ভয়ানক পথ অথচ চল্‌তে কষ্ট হচ্চে না কেন। বিশ্রাম পর্যন্ত নেবার চেষ্টা নেই!'

রাণী হেসে উঠলেন। বললেন, 'সত্যিই তাই; নিজের শক্তি যে কোথায় জমা থাকে নিজেরাই জান্‌তে পারিনে।'

দেড় মাইল পথ পার হয়ে যখন গণ্ডাবাজ চটিতে পৌঁছলাম তখন আন্দাজ বেলা প্রায় একটা। আর নয়, স্নমুখের ছোট চালার ভিতরে এসে ঝোলাঝুলি নামালাম। রাণী নেমে এলেন ঘোড়া থেকে। সহিসটা ঘোড়াকে নিয়ে কোথায় যেন দানাপানি খাওয়াতে গেল। নির্জন চটি, দোকানওয়ালা থাকে পথের নীচে। স্নমুখে পথের ওপারে একটা ঝরনা ঝর-ঝর করে নাম্‌চে। ভয়ানক মাছির উৎপাত। তিনি গায়ের চাদরখানা খুলে দিয়ে বললেন, 'পায়ে ঢাকা দিয়ে বসুন, আমি আসচি মুখে-চোখে জল দিয়ে,

আর সবাই না এলে ত রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হবে না।'

একটু পরে ধীরে ধীরে উঠে পাশের চটিতে এসে ঢুকলাম। রান্নাবান্নার আর দেরি করলে চলবে না।

ঘণ্টা দুই পরে ঝরনার জলে বাসন ধুয়ে যখন চটিওয়ালার কাছে হিসাব নিতে যাচ্চি তখন চালার ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে রাণী বললেন, 'রান্নাবান্না করলেন, আমাদের কই খেতে ডাকলেন না ? আমাদের যে উপবাসেই দিন গেল !' বলে তিনি শুষ্ক হাসি হাসলেন।

দিদিমারাও হাসলেন তাঁর সঙ্গে। দিদিমার দিকে ফিরে বললাম, 'আপনারা রাঁধলেন না কেন ?'

তিনি বললেন, 'দল-বল সব ছন্নছাড়া হয়ে গেচে। চৌধুরীদের ফেলে রেখে ত আমরা খেতে পারিনে ভাই।

অপরাহ্ণে যখন কালীমাঠি চটিতে এসে থামলাম তখন শরৎ-কালের মতো একখানা কানা মেঘ থেকে সপ্‌সপ্‌ করে বৃষ্টি নেমেচে। মেঘের পারে পশ্চিমের আকাশ তখনো রাঙা রৌদ্রে রক্তাভ, সুতরাং বৃষ্টি দেখে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। গোপালদার দল পিছন দিক থেকে এসে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করেচে। এখন আমরা গুটিচারেক বাঙালীর দল একত্র চল্‌চি। স্বামীজির দল এসে মিলেচে। চারটি দলে প্রায় ষাট জন লোক, তার মধ্যে স্ত্রীলোক প্রায় পঞ্চান্ন জন ! সবাই এসে থামল। দিদিমার দলের চৌধুরী মশাইদের এখনো দেখা নেই,

সেই সকাল থেকে ছাড়াছাড়ি। এদিকে বৃষ্টি দেখে আর অধিক-দূর অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে অনেকেই একটু ইতস্তত করতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত আকাশের দিকে চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই স্থির হ'লো।

দিদিমারা আর এগোবেন না, চটিতে আশ্রয় নিয়ে আজ রাত্রের মতো থেমে গেলেন, চৌধুরী মশাইরা তখনো এসে পৌঁছলেন না।

দলের সঙ্গে আবার পথ ধরলাম। এক মাইল পার হয়ে গিয়ে পাওয়া গেল রসিয়াগড় চটি। এই চটিতেই রাত্রিবাস।

পরদিন খাড়চটি ও ধূনারঘাটের ছোট পার্বত্য শহরটি যখন পার হয়ে দাড়িমডালী এসে পৌঁছলাম তখন সকাল হয়েচে। ধূনারঘাট থেকে পেয়েচি রামগঙ্গা নদী, আর পেয়েচি ছোট ছোট প্রান্তর। কোথাও কোথাও মাঠে চাষ-আবাদ চল্‌চে। ঢেউ-খেলানো প্রায় সমতল পথ। আশেপাশে কয়েকখানি গ্রাম। গ্রামগুলি সমৃদ্ধিশালী। বেলা আন্দাজ ন'টার সময় আরো প্রায় সাড়ে চার মাইল হেঁটে এতদিন পরে আমরা গাড়োয়াল জেলার শেষপ্রান্ত মেহলচৌরীতে এসে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম মেহল-চৌরী একটা হোম্‌রাচোম্‌রা কিছু, কিন্তু সে যে এত সামান্য তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এইখানে টিহরী রাজ্যের শেষ। যে সমস্ত গাড়োয়ালী কুলী একদিন হরিদ্বার থেকে যাত্রীর বোঝা বহনের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল, এইখান থেকে তারা বিদায় নেবে, এর

পরে বৃটিশ সীমানা ; বিনা ছাড়পত্রে বৃটিশ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করবার হুকুম তাদের নেই। আমরা সবাই একই দেশের মানুষ, সবাই ভারতবাসী, অথচ কি একটা রাষ্ট্রগত সামান্য কারণে আমরা বিচ্ছিন্ন। মেহলচৌরী অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর। পাশেই রামগঙ্গা নদী এবং নদীর উপরে একটা পুল।

বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় চৌধুরী মশায়ের দল মহা-সমারোহে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে তাঁদের জন-দশেক কাণ্ডি-ওয়ালা। রাণী এলেন ঘোড়ার পিঠে। দূর থেকে পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় হতেই অলক্ষ্যে অভিবাদনের পালা সমাপ্ত হ'লো। তারপরে বিশ্রাম এবং আহারাদির আয়োজন। এদিকে গোপাল-দার দলের বামুন-মার সঙ্গে কি-একটা কারণে আমার বাধলো' বচসা ; ক্রমে তিল হ'লো তাল। চারুর-মা চুপি চুপি বললে, 'বা'ঠাউর, ও বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করাও তোমার অপমান, তুমি চুপ করে যাও।'

হেসে বললাম, 'ঝগড়া ত করিনি চারুর-মা, ধমক দিচ্চি।'

চারুর-মা একগাল হেসে বললে, 'ও, এটা তবে ঝগড়া নয়, ধমক ? তাহ'লে আরো দুকথা শুনিয়ে দাও বা'ঠাউর, আমিও খুশী হই।'

আমরা সবাই চুপি-চুপি হাসাহাসি করতে লাগলাম, বামুন-বুড়ী নিল কান্না। স্নান করবার সময় হ'লো, গামছা নিয়ে এলাম

রামগঙ্গায়। পাথর ভেঙে নীচে নামতে হয়। একটু একটু বৃষ্টি পড়চে।

স্নান সেরে সাবধানে ও সন্তর্পণে রাণী তখন নদী থেকে উঠে যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, 'বাবারে, এমন চেঁচামেচি করতে পারেন আপনি? দেখচি নিতান্ত ছেলেমানুষ নন। শুনুন, এবার ওদের দল ছেড়ে দিন, চলুন আমাদের সঙ্গে, একসঙ্গে ফিরবো। আর হ্যাঁ, আপনি এখান থেকে একটা ঘোড়া করুন, বুঝলেন, দু'জনে ঘোড়ায় থাক্‌লে বেশ হবে!'

'কিন্তু—'

চোখ পাকিয়ে তিনি বললেন,—'আমার কথার অবাধ্য হবেন না—' বলে হেসে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

অমরা সিং চলে গেচে, আজ কাণ্ডিওয়ালারাও বিদায় নিল। বিদায়ের দৃশ্যটি করুণ। তুলসী, কালীচরণ, তোতারাম সবাই জানালো প্রীতিসম্ভাষণ। গাড়োয়ালীদের সে এক বিস্ময়কর সারল্য। চৌধুরী মশায়ের কাণ্ডিওয়ালারা তো কেঁদে-কেটেই অস্থির। রাণী নাকি তাদের সকলের মাতৃরূপিণী, এমন দয়াবতী, স্নেহময়ী দেবীর দেখা তারা নাকি জীবনে পায়নি। রাণীর দানে তাদের ঝোলাঝুলি ভরে উঠলো। কাপড়, চাদর, পুরনো কম্বল, বাসন এবং নগদ বক্‌শিশ; প্লাওনা-গণ্ডার চেয়ে বক্‌শিশের পরিমাণ বেশী হ'লো। সকলের চেয়ে যে কুলীটি বয়সে ছোট, সে কিছুই চাইল না, শুধু নিতান্ত শিশু-সন্তানের মতো রাণীর

আঁচলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। পর যখন আপন হয় তখন সে আপনার চেয়েও আপন। এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। রাণীর চক্ষুও শুষ্ক রইলো না। রাজ-কন্যা ও দিনশ্রমিকের মধ্যে আজ আর কোনো ব্যবধান নেই। দুঃখে, দুর্যোগে, পথে পথে প্রায় এই দীর্ঘ তেত্রিশ দিনে আজ তারা জান্‌লো, সে মা তাদের আপন মা নয়, পৃথিবীর জনারণ্যে মা তাদের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন।

এদিকে আমাকেও বিদায় নিতে হ'লো সকলের কাছে। বামুন-বুড়ীর সঙ্গে বিবাদের পর গোপালদার দলকে আজ এইখান থেকে ত্যাগ করতে হ'লো। যদি সম্ভব হয় দেশে গিয়ে আবার দেখা হবে। দীর্ঘকাল এসেচি গোপালদার সঙ্গে, সেই হৃষীকেশে আলাপ, আজ তাঁকে ছাড়তে বড় লাগলো। যাই হোক্, বেলা তিনটে নাগাৎ স্বামীজি ও গোপালদার দল ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চড়িয়ে মেহলচৌরী পরিত্যাগ করে গেলেন। তখন বেলা অপরাহ্ণ।

চৌধুরী মশায়দের ভাবগতিক দেখে মনে হ'লো, আজ মেহলচৌরীতেই রাত্রিবাস করতে হবে, তাঁদের বিশেষ তাড়া নেই। এদিকে রাণীক্ষেত পর্যন্ত একটা ঘোড়া নিজের জন্য ঠিক করেচি। ঘোড়া ঠিক করে চৌধুরী মশায়কে তাড়া দিলাম, তিনি অবশেষে যেতে রাজী হলেন।

অতএব আর বাধা নেই। যাত্রা করতে বেলা পাঁচটা বেজে

গেল। ঘোড়ার পিঠে কম্বল ও ঝোলা চাপিয়ে লাঠিটা দিলাম সহিস মহেন্দর সিংয়ের কাছে,—সহিসটার বেশ 'মাই ডিয়ারি' ভাবগতিক। তারপর মাথায় রাজা শিবাজীর কায়দায় পাগড়ি বেঁধে বীরজনের মতো গিয়ে চড়লাম ঘোড়ার পিঠে। দড়ির জিন্ আর লাগাম, অশ্বারোহীর হাতে গাছের একটা ডাল। তা হোক্, তাই দিয়েই ঘোড়ার ল্যাজের দিকে আঘাত করে বললাম, 'হট্, হট্ !'

ঘোড়া পা চালিয়ে হাঁট্‌তে লাগলো, কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখি রাণী তাঁর ঘোড়া হাঁকিয়ে আসচেন সহাস্য বদনে। পাহাড়ের একটা বাঁকে এসে আমরা একত্র হলাম। তিনি বললেন, 'ঘোড়া আমাদের ছুটিয়ে দিই, কি বলেন ?'

বললাম, 'কিন্তু তারপর ?'

'তারপর আবার কি, আমরা এগিয়ে যাই।'

সূর্যদেব নামচেন অস্তাচলে। কোথাও কোথাও গাছে গাছে অরণ্যপক্ষীর সান্ধ্য-কাকলী শুরু হয়েচে। দক্ষিণে নদীর উপরে নাম্‌চে ছায়ান্ধকার। দু'জন সহিস চলেচে পাশে পাশে, তারা জমিয়েচে গল্প। আমরাও চলেচি পাশাপাশি। যেন স্বপ্নলোক থেকে দু'টি পক্ষীরাজ আমাদের দু'জনকে নিয়ে নাম্‌চে—নেমে আসচে শূন্যলোক পেরিয়ে।

স্বর্গ থেকে বিদায়। ডাক এসেচে মর্ত্যভূমির, সেখানে আবার ফিরে যেতে হবে। সেই কলহ-কলঙ্ক, বিদ্বেষ ও মালিন্য, সামান্য

স্নেহ-মোহ-বন্ধন সৌখীন বন্ধুত্ব, নগণ্য আত্মীয়তা। তবু ফিরে যেতে হবে। মহাপ্রস্থানের পৌরাণিক পথ ছেড়ে এসেচি কর্ণ-প্রয়াগে ; এ-পথ ঐতিহাসিক, দক্ষিণ-পূর্বে টিহরী-সীমানা মেহল-চৌরী হয়ে এই পথরেখা চলে এসেচে বর্তমান সভ্য ভারতের দিকে, মানবসমাজকে এসে স্পর্শ করেচে। স্বর্গ-প্রবাসে বহুদিন অতীত হয়েচে, স্মৃতি ও বিস্মৃতির একটি গোধূলি-আলোয় নেমে চলেচি, কানে আসচে মর্ত্যভূমির ক্ষীণ কলরব, জীবনের বিচিত্র জটিলতা হাতছানি দিয়ে ডাক্‌চে। চল্, আবার নীচে নেমে চল্!

মেহলচৌরী রইলো পিছনে। চড়াই পথে যাত্রীরা ধীরে ধীরে উঠচে। আমাদের ঘোড়া চলেচে মন্থর গতিতে। সহিসরা আসচে পিছনে পিছনে। দক্ষিণে খদের নীচে দিনান্তকালের অন্ধকার গুটি-গুটি দল পাকাচ্চে। সম্মুখে পর্বতের পারে পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে উঠেচে, সন্ধ্যা এসে বসচেন অপরাহ্নের আসনে। বাম দিকের সানুদেশে চিড়-জঙ্গলে মন্থর বাতাস মাঝে মাঝে গুঞ্জন-ধ্বনি তুলে চলেচে।

পথ এবার প্রথম দিকটা চড়াই, তারপর সমতল, চল্‌তে আর বিশেষ কষ্ট নেই,—কিন্তু সেই পথের নানা জটিলতা। কোথাও বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্চে, কোথাও বা আমরা ঢুকচি একেবারে পাহাড়ের অন্দর-মহলে! ঘোড়া দু'টি আমাদের শান্ত ও নিরীহ, তাদের চালাবার প্রয়োজন নেই, নিজেদের খেয়ালে তারা বৈরাগীর মতো উদাসীন হয়ে চলেচে। তারা জানে আমরা

কতদূরে যাবো, কোথায় যাবো।

এই দীর্ঘ তেত্রিশ দিন যে অগণ্য যাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েচে তাদের কথা ভাবচি। আজ তারা যদি আমাকে দেখে তবে চিনতে পারবে না। তেত্রিশ দিন ধরে যে-মানুষ স্বল্পভাষী, নির্লিপ্ত ও উদাসী, আজ তার সেই চেহারার বদল হয়েচে। যে মানুষ বিজনী, ছান্তীখাল, গুপ্তকাশী, রামওয়াড়া, উখীমঠ প্রভৃতির চড়াই-পথ মুখ বুজে পার হয়ে এসেচে, আজ তার এই সৌখীন অশ্বারোহণ,—তারা সত্যি অবাক হয়ে যেত। তাদের ধারণা, আমি পাথরের কুচির মতো কঠিন, আমার মতো কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বাস্থ্যবান যাত্রী এ-বছর নাকি একজনও আসেনি। তারা বোধ হয় দেখলেও বিশ্বাস করবে না যে, আমি আজ হয়েচি ফোয়ারার মতো মুখর।

আজ আমাকে বিশ্বাস তারা করবে না। এমন কথা তাদের কেমন করে বোঝাবো, শীতের পরে আসে বসন্ত, তারপরে নেমে আসে বর্ষা! একদা নিগূঢ় আনন্দ-বৈচিত্র্য তপস্যায় শঙ্করাচার্যের উত্তরধামের পথে চলেছিলাম—পরনে গৈরিকবাস, মাথায় জট-পাকানো চুল, সঙ্গে ছিল শ্মশানের ভূতপ্রেতের দল, চক্ষু ছিল শিবনেত্র। উত্তরের হাওয়ায় দিনে দিনে আমার হৃদয়ের ভিতরে জমেছিল তুষারের স্তর,—কঠিন নিশ্চল হিমমরুরাশি। তারপরে নেমে এলাম চঞ্চল বসন্তের উপবনে মালতী-মল্লিকা-ছাওয়া অরণ্য-বীথিকায়, দক্ষিণের দাক্ষিণ্যে পেলাম খুঁজে মাধুর্যের আনন্দ!

অস্থিমালার পরিবর্তে আমার অঙ্গে অঙ্গে আজ রাঙা পলাশে স্তবক; মাথায় ঋতুরাজের সোনার মুকুট, চিতাভস্মের বদলে পুষ্পরেণু, হাতের শিঙা হয়েছে বাঁশরী,—বসন্তের বন্যায় আমা বৈরাগ্য ভেসে গেচে।

ঘোড়াকে ছুটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ছোটানো অ সহজ নয়। আঘাত করলে খানিকটা এগোয়, আবার দেখতে দেখতেই তার গতি মন্থর হয়ে আসে। এমনি করেই কাছাকাছি যখন এসে ঘোড়া থেকে নামলাম তখন বেশ হয়েচে। সম্মুখে পাশাপাশি খান দুই কোঠা, কোলে বারান্দা প্রথম চটিটার নীচে বেশ বড় একখানা খাবারের দোকান, রাতটা তবে মন্দ কাটবে না। চারিদিকে নানা গাছের পিছন দিকে খানিকটা খোলা সমতল জায়গা, পথের এপারে শান্‌বাঁধানো একটা ঝরনা। একটু আগে বোধ করি এখানে এ পশলা বৃষ্টি হয়ে গেচে, সমস্তটা স্যাঁত-স্যাঁত করচে।

চৌধুরী মশায় সদলবলে এসে হাজির হলেন। প্রথম চটি দোতলায় সবাই মিলে আশ্রয় নেওয়া গেল। পাশের বাড়িটা একদল হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী এসে উঠলো। ঘোড়াগুলোকে মহেন্দর সিং ও প্রেমবল্লভ ঘাস-জল খাওয়াতে কোথায় নি গেল,—কথা রইলো ভোর রাত্রে আবার তারা এসে হাজি হবে। মোটঘাঠ খুলে দোতলার ঘরে ও বারান্দায় চৌধু মশায়রা বিছানা পাতলেন, নীচের পুরির দোকান থেকে যৎ

জলযোগের ব্যবস্থা হ'লো,—রাণী একটা বাল্‌তি নিয়ে ঝরনা থেকে জল নিয়ে গেলেন। বয়স যাদের অল্প, পরিশ্রমের ভাগটা তাদের উপরেই বেশি পড়ে।

আহারাদির পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যাগ্রহণ। ইতিমধ্যে সেই ট্যারাচোখো পিসির সঙ্গে কার যেন একটু মনোমালিন্য হ'লো, তিনি জলগ্রহণ না করেই বারান্দার ধারে কাঁথা-কম্বল বিছিয়ে শুলেন। পিসির সমস্ত হাসি-রসিকতার পিছনে থাকে একটি বিষাক্ত সাপের ফণা, মানুষকে অতর্কিতে ছোবল মারাই তার রীতি। কিন্তু এই বিলীয়মান কোলাহলের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে তাকিয়ে যে-দৃশ্য আমি সেদিন দেখেচি তা আজো স্পষ্ট মনে করতে পারি। রাণী যে দীক্ষা নিয়েচেন, সকাল-সন্ধ্যা তিনি যে জপে বসেন তা আমি জানতাম, আড়ালে-আবডালে লক্ষ্যও করেচি। কিন্তু তার চেহারা যে এমন তা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। সম্মুখে লণ্ঠনের আলো জ্বল্‌চে, তারই কাছে আসনের উপরে তিনি ধ্যানে বসেচেন, চক্ষু দুটি মুদিত; মুখের উপরে শুধু যে তাঁর একটি অপূর্ব লাবণ্য ও দীপ্তি ফুটে উঠেচে তাই নয়, সে-মুখে একটি প্রশান্ত পবিত্রতা, সংযম ও সহজ কৃচ্ছ্রসাধনার একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য,—এমন জ্যোতির্ময় রূপ সহসা চোখে পড়ে না! আমি নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

রাত্রে শীত পড়লো, কিন্তু কম্বলখানি ছাড়া যখন দ্বিতীয় শয্যা নেই তখন তাই নিয়েই বারান্দার এক কোণে স্থান নেওয়া গেল।

উত্তর ও দক্ষিণ দিক খোলা, হু হু করে বাতাস বইচে,—নীচের গোলমাল শান্ত হয়ে এলো, পাশের হিন্দুস্থানী দলের একঘেয়ে গানের গোঙানিও থেমে আসচে, আমার চোখে তন্দ্রা জড়িয়ে এলো। মাথার কাছে চৌধুরী মশায় শুয়েচেন—অতি অমায়িক মানুষ এই চৌধুরী মশায়,—তাঁরই পায়ের দিকে শুয়েচে ট্যারা-চোখো পিসি,—ধাঁ ধাঁ করে পিসির নাক ডাকচে! বারান্দার ভিতর দিকে দলের অন্যান্য বৃদ্ধারা, ঘরের ভিতর আছেন দিদিমা ও রাণী। রাত্রি নীরব ও নিশুতি, দু'দিন আগে গেচে অমাবস্যা। দ্বিতীয়ার শীর্ণ চন্দ্র কখন্ পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেচে, চারিদিক ঘোর অন্ধকার। আকাশের পরিচ্ছন্ন নক্ষত্রগুলি দপ্ দপ্ করে জ্বলচে।

পরদিন প্রভাতে ঘোড়া নিয়ে সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়লাম। আগে আগে বেরিয়ে পড়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেচি।

মাসিচটি পার হয়েচি। পথ সমতল, কোথাও কোথাও গ্রামের চিহ্ন দেখা যাচ্চে। গাছের ছায়ায় ঢাকা চওড়া পথ, পাহাড়ের চূড়াগুলি দূরে দূরে সরে গেচে। পল্লী-প্রান্তর নীরব, হু হু করে বসন্তকালের হাওয়া চলেচে। পথে আর ঝরনা পাওয়া যাচ্চে না, রামগঙ্গা নদী আছে কাছাকাছি। বুড়কেদারে মধ্যাহ্নের আহারাদি শেষ করে আবার অগ্রসর হলাম। আজকাল সুখ এবং স্বস্তি দুই-ই লাভ করচি। ঘোড়ায় চড়ে চলি এবং দিদিমার কাছে রাঁধা ভাত পাই, বাসনও মাজতে হয় না। যেদিন দুঃখের

মধ্যে হরিদ্বার থেকে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এত আনন্দের ভিতর দিয়ে আমার যাত্রা শেষ হবে। ঠাকুর-মা প্রমুখ গোপালদার দল একবেলার পথ এগিয়ে গেচে, ইচ্ছা হচ্চে ছুটে গিয়ে তাদের ধরে আমার সৌভাগ্যের কথা শোনাই। গোপালদার ধৈর্য ও সহনশীলতায় আমি সত্যই বিস্মিত ও মুগ্ধ। কিন্তু একটা বড় চক্ষুলজ্জার কারণ ঘটেচে। দিনের বেলা দিদিমা ও রাণী রেঁধে দেন, চৌধুরী মশায় যত্ন করে খাওয়ান, অথচ মূল্য বাবদ কিছু গ্রহণ করতে রাজী নন্। আহারের সময় আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠি। আমার সঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জা দেখে রাণী একটু ইতস্তত করেন। আমার সম্মানে আঘাত লাগা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ।

সন্ধ্যায় পেঁছানো গেল নলচটিতে। মনোরম স্থান। কাছেই একটা কদলীর জঙ্গল, তারই পূর্বদিকে ছোট্ট একটি ডাকঘরের নিকটেই ধর্মশালা। কিয়দ্দূরে একটি নিভৃত পুরাতন মন্দির, তারই কাছে জনকয়েক সংসারত্যাগী সাধুর একটি আশ্রম। ঘোড়া থেকে নেমে আমরা চটিতে এসে রাত্রির আশ্রয় নিলাম।

আর সেই দুস্তর পথ নেই, নেই সঙ্কীর্ণ আকাশ,—পর্বত-রাজির জটলার মধ্যে প্রাণান্তকর চড়াই-উৎরাইও নেই। এখন আকাশের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, নদী এখন আর গর্জমান নয়, স্রোতের সেই অবিরাম ঝর ঝর শব্দ আর নেই,—এখন দেশের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেচি

ব্রামগঙ্গার তীরে পাতার একখানি কুটিরের মধ্যে রান্নাবান্নার আয়োজন চলতে লাগলো। নিকটেই একটি গ্রাম, কয়েকখানি দোকান,—একখানি কামারের দোকানে হাতুড়ির কাজ চলেচে। চটির পিছনে নদীর ধারে অল্প চাষ-আবাদের চিহ্ন দেখলাম। আজ অনেক দিন পরে স্নান করবার সুবিধে পাওয়া গেল। স্নান সেরে এসে দেখি, পানীয় জলের নিতান্ত অভাব। লোকপরম্পরায় জানা গেল, কিছুদূরে এক ভূমিগর্ভে চোঁয়ানো ঝরনার জল পাওয়া যায়। বালতি নিয়ে রৌদ্রপথে ছুটলাম। যে-উপায়ে সেদিন এক জলচিহ্নহীন শুষ্ক নদীর পাথরের নীচে থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

নিদ্রার পর যথারীতি মোটঘাট বেঁধে যাত্রার আয়োজন করা গেল। ঘোড়ায় চড়ার নেশা ফুরিয়েচে, অতএব তার পিঠে ঝোলা-কম্বল চাপিয়ে এক বৃদ্ধাকে চড়িয়ে দিলাম, বৃদ্ধা আড়ষ্ট হয়ে চলতে লাগলো।

কিন্তু দেখতে দেখতে আকাশের চেহারা গেল বদ্‌লে। দিগ্‌দিগন্ত আবৃত করে কৃষ্ণকায় মেঘ এলো চারিদিক থেকে ঘনিয়ে। গাছের আগায় উঠলো ঝড়ের হাওয়া, দেখতে দেখতে মুষলধারে নাম্‌লো বর্ষণ। পাহাড়ের বৃষ্টি বিপজ্জনক, জলের ফোঁটাগুলি তীব্র ও ধারালো। সকলে বিভ্রান্ত হয়ে কে কোথায় আশ্রয় নেবে ঠিক নেই। কিন্তু আশ্রয়ই বা কোথায়? ভিজতে ভিজতে দ্রুতপদে চলা ছাড়া আর উপায় ছিল না। অনেকেরই

কাছে ছিল অয়েলক্লথ—সাধারণত অয়েলক্লথ ঢাকা দিয়ে এদেশে কাণ্ডিওয়ালারা যাত্রাদের মালপত্র বহন করে ;—সেই অয়েল-ক্লথের টুকরো মাথায় চাপিয়ে দিদিমা ও আরো দু'একজন চল্‌তে লাগলেন। রাণীকেও তাঁরা এক টুকরো অয়েলক্লথে ঢাকতে ছাড়লেন না, ঘোড়ার পিঠে এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে তিনি চললেন। আমি পিছন থেকে হাসছিলাম।

পাহাড়ী দেশের বৃষ্টি, দেখতে দেখতে আবার আকাশ হাল্‌কা হয়ে এলো। শূন্য মনে ধীরে ধীরে চলছিলাম। বৃষ্টি ধরে গেল, ঝড় থাম্‌লো, আকাশ হ'লো পরিষ্কার, পথে একটা পুল পার হয়ে দক্ষিণ দিকে চললাম। দেখতে দেখতে শেষ অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্র আবার নির্লজ্জের মতো দেখা দিল। আরো মাইল দুই পথ হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে সন্ধ্যার সময় আমরা এক ধর্মশালার কাছা-কাছি এসে পৌঁছলাম। স্থানীয় কয়েকজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এক দোকানের ধারে বসে গল্প করছিলেন। বাঙ্গালীর দল দেখে তাঁরা অগ্রসর হয়ে এসে আলাপ করলেন। সুমুখের ধর্মশালাটা বাসের অযোগ্য বিবেচনা করে তাঁরা এদিকে একটা স্কুল-ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্কুল-ঘরের বারান্দায় আমাদের আস্তানা পড়লো। বারান্দার একটা দিকে আমরা সবসুদ্ধ চৌদ্দজন যাত্রী আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টির জন্য তখনো কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্র স্যাঁত-স্যাঁত করচে, কি ভাগ্যি যে পথের হাওয়ায় খানিকটা শুকোতে পেরে-

ছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনালো, দু'তিনটি লণ্ঠন জ্বালানো হ'লো। যাত্রীর জটলার মধ্যে রাণী ও দিদিমা ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আজ অনেকদিন পরে ঝুলির ভিতর থেকে কাগজ আর কলম বার করে নোট্ লিখতে বসলাম। কত পথ, কত ঘটনা, কত স্মৃতি! জীবনের বাহ্য কাহিনাগুলি লেখা চলে, কিন্তু তার সর্বোত্তম মুহূর্তগুলির দুঃখ ও আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন কাজ। কলম নিয়ে বারান্দার একান্তে বসে তাই প্রথমেই মনে হ'লো কী লিখি। লিখে জানানো যায় কতটুকু।

পরদিন বেলা আটটা। দ্বারিহাটের পাহাড়ী ছোট শহর পার হয়েচি। দুইটি পথ গেছে দুইদিকে, একটি আলমোড়ার দিকে, অন্যটি গিয়ে ছুঁয়েচে রাণীক্ষেত। রাণীক্ষেতের পথ ধরলাম।

আজ রোদ অত্যন্ত প্রখর লাগচে, গরমে সবাই ক্লান্ত। ক্ষণে-ক্ষণে গলা শুকিয়ে উঠচে। ঝরনাও নেই, জলাশয়ও নেই। জলের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। কাল থেকেই রীতিমতো জলকষ্ট শুরু হয়েচে। শুষ্ক রুক্ষ গাছপালাহীন পাহাড়, ছায়া কোথাও নেই। গরমের এলোমেলো বাতাসে থেকে থেকে চারিদিক ধুলোয় অন্ধকার হয়ে আসচে।

জল, জল, জলের জন্য আমরা বড়ই কষ্ট পাচ্চি। সব রকমের পীড়ন সহ্য করেচি, কিন্তু জলাভাবের পীড়ন এই প্রথম। একটি ঘটি জল যদি কেউ এখন দেয় তবে এই ঝোলা-কম্বলটা অনায়াসে তাকে দান করতে পারি।

বেলা আন্দাজ বারোটার সময় এক দোতলা চটিতে এসে উঠলাম। এখান থেকে দূরে পাহাড়ের মাথায় রাণীক্ষেতের অস্পষ্ট শহরটি দৃষ্টিগোচর হচ্চে। চটিতে পৌঁছেই জলের জন্য ছুটোছুটি করলাম। কাছেই খানিকটা চাষের জমি, তারই আ'ল পার হয়ে নীচে নেমে গেলে নাকি একটি ঝরনার ধারা দেখা যায়।

অনেক কষ্টে জল সংগ্রহ করে তৃষ্ণা মেটানো গেল। দিদি-মারা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন বিজয়াদিদি কাঁদতে কাঁদতে। কি ব্যাপার? দেখা গেল তাঁর পায়ের তলায় পাথরের কুচি ফুটে অপরিসীম যন্ত্রণা হচ্চে, পথ আর তিনি চলতে পারচেন না। বিজয়াদিদি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বিলাপ করতে লাগলেন। রান্না-বান্নার আয়োজন চল্‌তে লাগলো।

পড়ন্ত বেলায় আবার যাত্রা।

আবার সুমুখে এক বিপুল বিস্তীর্ণ চড়াই। প্রথমটা ভয় পেয়ে গেলাম: কিন্তু এইটিই শেষ চড়াই, শেষ পাহাড়, এইটি কোনো রকমে পার হতে পারলেই আমাদের মুক্তি। পথের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাবো এবারের মতো, একথা ভাবতেই আনন্দ লাগচে। অথচ পথ আমাদের এবারের মতো বিদায় দেবে একথা ভাবতেও বেদনা অনুভব করচি। কিন্তু কেন—কেন ভালো লাগচে এই আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ-দোলা? কী পেয়েচি? কীই-বা হারাবো?

আর মাত্র সামান্য ছয় মাইল পথ। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল, খানিকটা বেশী পরিশ্রম করে সোজা উঠে গেলে পথ অনেকখানি শর্টকাট্ হয়। তাই করা গেল, দুর্দান্ত তেজে বেপরোয়া হয়ে পিঁপড়ে যেমন দেয়াল বেয়ে ওঠে, তেমনি করে প্রায় আধ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর খাড়া পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠলাম।

অপরাহ্লের রোদ স্তিমিত হয়েচে। চিড়গাছের ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাণীর ঘোড়া চলেচে। চারিদিকে একটি প্রশান্ত নীরবতা। এক-একবার বাতাস বয়ে যাচ্চে—সে বাতাস অরণ্যের মর্মরধ্বনি নয়, সেটি চিড়বনের দীর্ঘনিশ্বাস, তা'তে যেন সুস্পষ্ট একটি বেদনার ঝলক। আমাদের এই অর্থহীন অচিরস্থায়ী বন্ধুত্বের দিকে তাকিয়ে কালের দেবতা যেন করুণ নিশ্বাস ফেলচেন।

চার মাইল পথ পার হয়ে সন্ধ্যার সময় আমরা পথের শেষ চটিতে এসে শেষরাত্রির মতো আশ্রয় নিলাম। দূরে পূর্বদিকে রাণীক্ষেত শহরের কয়েকটি আলো এখান থেকে দেখা যাচ্চে; কাল প্রভাতে ওখানে গিয়ে পৌঁছবো। পাশাপাশি দু'টি পাকা ঘর,—এমন সুন্দর থাকার জায়গা আমরা খুব কমই পেয়েচি; ঘরের কোলে একটি খাবারের দোকান। দোকানে রাত্রির আহারের বন্দোবস্ত করা গেল। আমি একখানি চৌকি আশ্রয় করে এদিকে পড়ে রইলাম। শুক্লপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র তখন